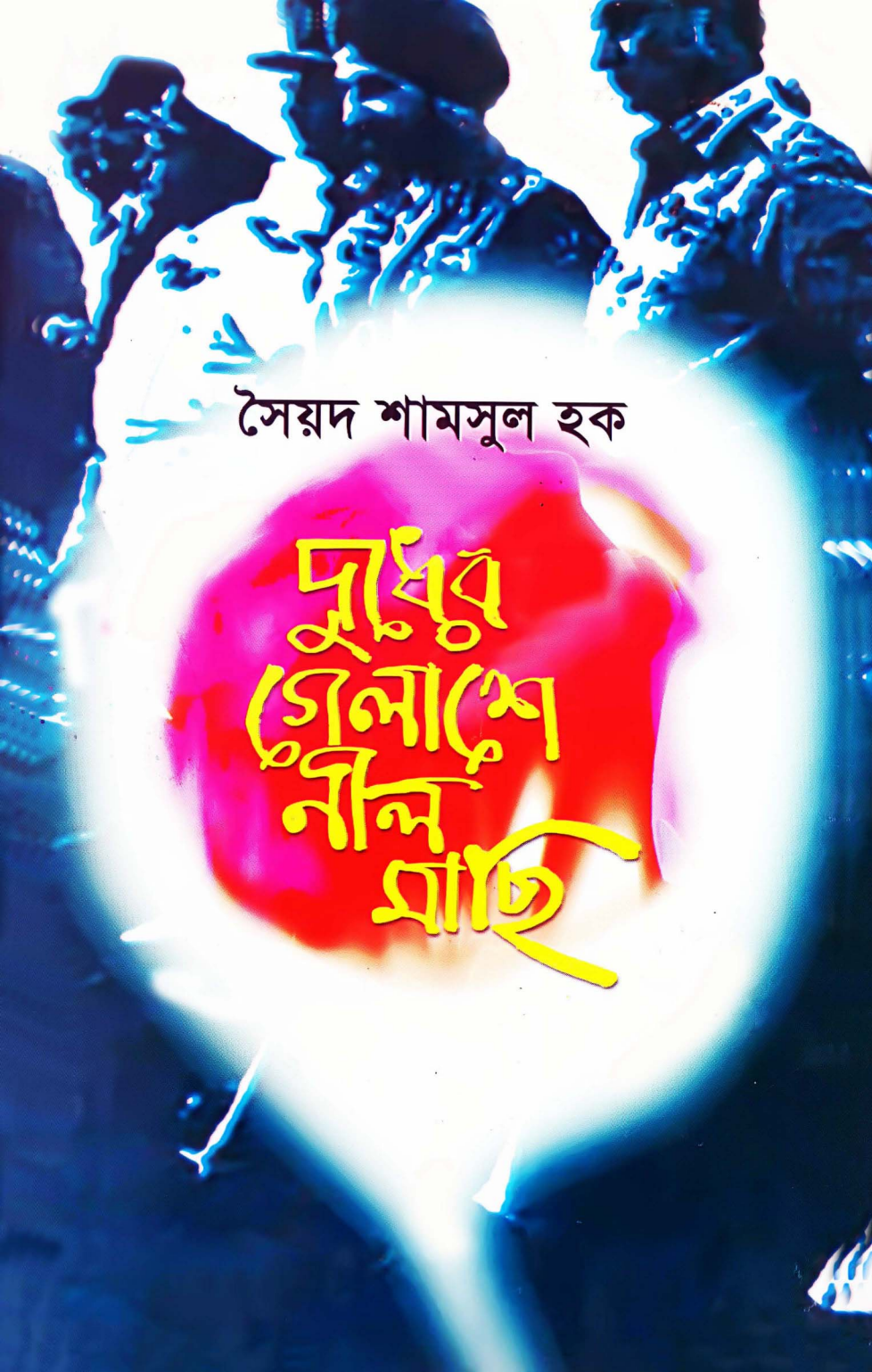
সৈয়দ শামসুল হক
দুধের গেলাশে নীল মাছি

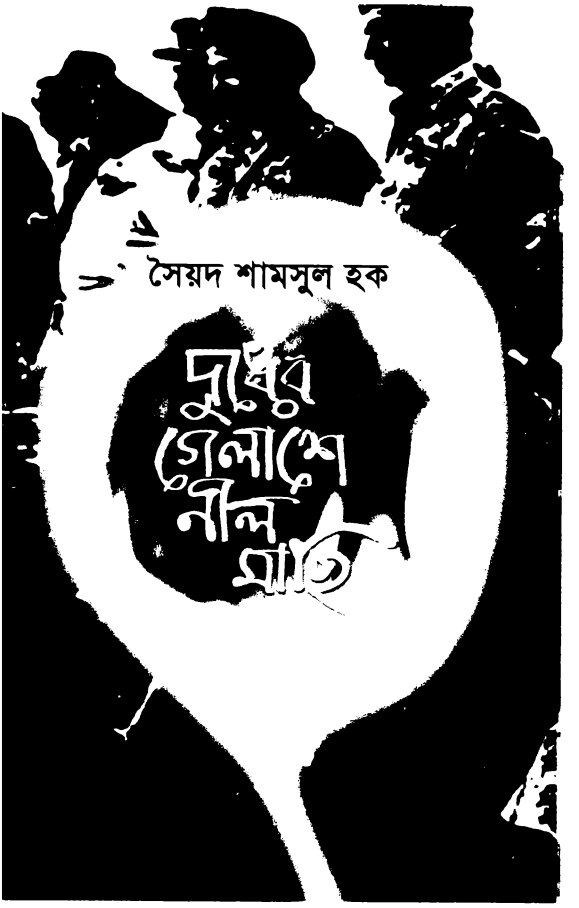

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।
জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সপরিবারে নিহত হলেন।
পৃথিবীর ইতিহাসে মর্মন্তুদ এই
হত্যাকাণ্ডের দিনটিতে
লণ্ডন নগরী, বিবিসির বাংলা বিভাগ
এবং লণ্ডন প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী

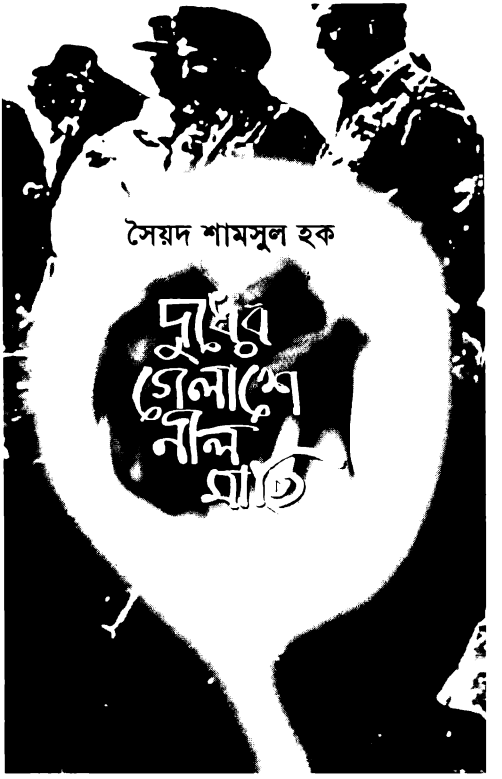
সৈয়দ শামসুল হক
দুধের গেলাশে নীল রাত

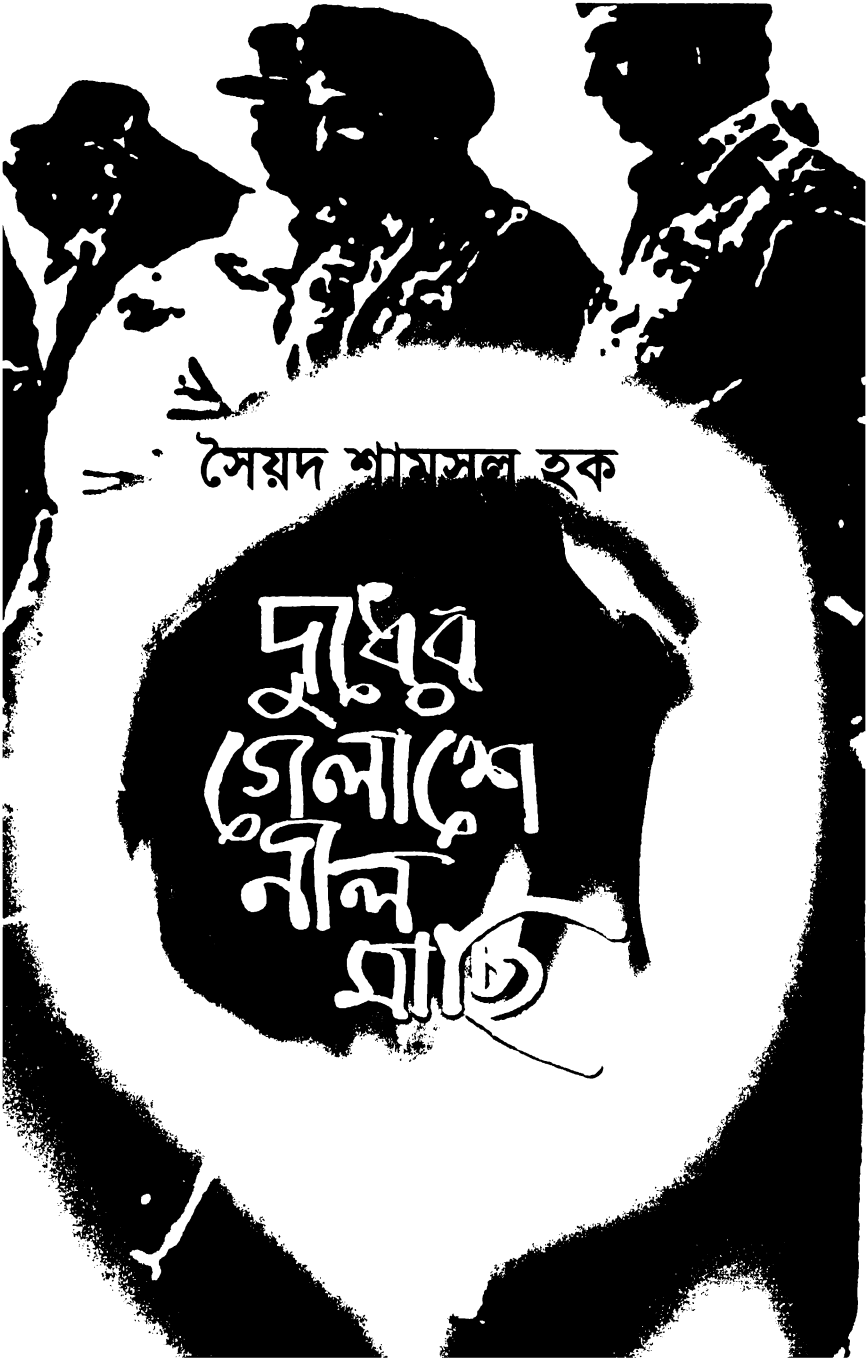

সৈয়দ শামসুল হক

দুধের গেলাশে নীল মাছি

প্রকাশক
ডা. তানিয়া সুলতানা লাভলী
সুলতানা পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা) ঢাকা- ১১০০
ফোন : ৭১১১৬৪২

সুলতানা প্রথম সংস্করণ ❑ একুশে বইমেলা ২০১০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মাসুক হেলাল

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯৫

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

ISBN
984-8701-27-3

Dudher Glasha Neel Machi Written By : Sayed Samsul Haque
Published by Dr. Tania Sultana Lovely
Sultana Publications, 38 Banglabazar, 3rd Floor, Dhaka-1100
Printed by Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka-1100

উৎসর্গ

ইমদাদুল হক মিলন

সবিনয় নিবেদন

এই উপন্যাসটির প্রাথমিক খসড়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; এখন বই করতে গিয়ে রচনাটির কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি। উপন্যাসে বাঁকা হরফে মুদ্রিত অংশগুলো প্রামান্য বিবরণ হিসেবে সংকলিত হয়েছে– কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত আকারে-এই বইগুলো থেকে- অধ্যাপক আবু সাঈদ রচিত 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ফ্যাকটস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস্', এম আর আখতার মুকুল রচিত 'মুজিবের রক্ত লাল' এবং রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, সংবাদ ও ভাষণের সংকলন।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সৈয়দ শামসুল হক

ঢাকা

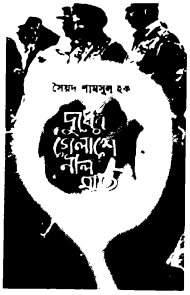

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।

বিশাল কালো জলের ওপর আমি এক ভেলায় ভেসে চলেছি। হঠাৎ সেই ভেলা তীর বেঁধা পাখির মতো বিকট নিঃসঙ্গ চিৎকার করে জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো আকাশে। আর আমি ছিটকে পড়ে যেতে যেতে আঁকড়ে ধরলাম, তাকিয়ে দেখলাম, টেলিফোন।

বিছানার পাশে বেজে চলেছে টেলিফোন।

এই এত ভোরে কে আমাকে ডাকছে? স্বপ্নের ভেতরে পড়ে যাবার সেই আতংক এখনো আমার কপাল ভিজিয়ে রেখেছে। জলের গেলাশের পাশে ঘড়িতে বাজে সাতটা সাঁইত্রিশ। ঠিক ভোর একে বলা যায় না। কান পাতলে শোনা যায় সারা লণ্ডন জেগে উঠেছে আমার জেগে ওঠার অনেক আগে। জানালার ভারী পর্দার ভেতর দিয়েও দিনের আলো আর মানুষের চলাচল চুঁইয়ে পড়ছে।

আর বেজে চলেছে আমার টেলিফোন।

'হ্যালো।'

'ঘুমিয়ে আছেন এখনো?'

ওপাশের কণ্ঠে বিদ্রুপের আভাস, আর তারই খোঁচায় মুহূর্তে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেলো। স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলাম গলা, তবু না চেনার ভান করলাম ভেতরের বিরক্তিটা মাহমুদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

'চিনতে পারছেন না? মাহমুদ বলছি। খবর শুনেছেন?'

'কি খবর?'

'খবর তো আপনারই আগে রাখার কথা। আপনি বিবিসি'র লোক।'

শেষ কথাটা আমার বিরক্তির মাত্রা ধাঁ করে বাড়িয়ে দিলো। বললাম, 'মাহমুদ সাহেব, আমি বিবিসি'র লোক নই, ওদের চাকরি করি না, মাঝে মাঝে গিয়ে খরব পড়ি, ব্যস।'

'এতো খবর পড়েন, আর এ খবরটা পাননি?'

'না।'

'না?'

'খবরটা কি?'

হঠাৎ বুকের ভেতরে ধ্বক করে উঠলো। দেশের কোনো খবর নয় তো? প্রায় অনুনয় করেই বললাম, 'হ্যালো, সত্যি আমি কোনো খবর পাইনি। বলুন না কি হয়েছে?'

'শেষ। সব শেষ।'

'কি শেষ? কিসের কথা বলছেন?'

দ্রুত গলায় মাহমুদ বলে গেলো, 'শেখ মুজিব। গত রাতে বঙ্গবন্ধুকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর বাড়ির সবাইকে। মিলিটারী ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শোনেননি কিছুই? ও মাহতাব সাহেব, আপনি কিছুই শোনেননি? ঘুমিয়ে আছেন?'

'না, না, না।'

'আমি আরো ভাবলাম, আপনার কাছে পুরো খবর পাবো।'

বঙ্গবন্ধু নেই? নিহত? আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি ভেলায় ভেসে যাবার?

'বিবিসি'র ইংরেজি খবরে সকালেই বললো।'

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। এই রক্তের ইতিহাস মূমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ; এদেশের ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন।

জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দু:খী মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যগুরু-আমরা বাংগালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, দেখে যান কি ভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কি ভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে? কার সংগে কথা বলবো? আপনারা যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সংগে কথা কলবো? পাঁচ ঘন্টা গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন, বলেছেন, দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন- মার্শাল-ল 'উইথ্‌ড্র' করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।

তাকিয়ে দেখলাম আমার চারদিকে। সোফা, টেবিল, আয়না, মুখ ধোয়ার স্ট্যাণ্ড, টেলিভিশন, কার্পেটের ওপর বইয়ের স্তুপ, দেয়ালে টানা সুতোয় ঝুলছে কয়েকদিন আগে আমার জন্মদিনে পাওয়া গোটা দশেক কার্ডের মালা। না, জেগেই তো আছি আমি। না, স্বপ্ন তো দেখছি না। আমি লণ্ডনে আছি, দেশ থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে, আমার এক-কামরার বাসায়, সরু একফালি বিছানায় নীল কম্বলে গা ঢেকে আধো শোয়া বসে আছি। বাইরে গাড়ি চলছে, কোথায় কে একটা দরোজা বন্ধ করছে, পাশের ফ্ল্যাটে রেডিওর গান চলছে এবং আমি আত্মনির্বাসিত, এইসবের ভেতরে এখনো টের পাচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ড চলছে, আমার আঙ্গুলের ডগায় অনুভূতি আছে, আমার ঘরে বাতাসের ঠাণ্ডা আছে কম্বলের ভেতরে উষ্ণতা আছে।

শেখ মুজিব নিহত? গুলীতে? সপরিবারে?

এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় - তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। কি করবো? কোথায় যাবো? কাকে জিজ্ঞেস করবো? বুকের ভেতরে আমারই কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠলো, 'না, আমি বিশ্বাস করি না, এ হতে পারে না, শেখ মুজিবের মৃত্যু এভাবে হতে পারে না।'

পারে না-ই বা কেন? পর মুহূর্তের এই প্রশ্নটির কোনো উত্তর আমার জানা নেই। জানালার পর্দা খুলে দিলাম। ঘরের ভেতরটা ভরে গেলো রোদ্দুরে। রাতের অন্ধকার, শীত, দুঃস্বপ্ন লাফ দিয়ে পালিয়ে গেলো সারাটা দিনের জন্যে। কিন্তু একই দ্রুততার সঙ্গে লাফিয়ে এলো শংকা এবং মরুভূমিতে জলের ভয়াবহ তৃষ্ণা।

বিবিসি'র বাঙলা বিভাগে ফোন করে এখন কাউকে পাবো না। ওরা সকাল ন'টার আগে আসবে না। তবু ফোন করলাম। এতোবড় একটা ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এসে গেছে অফিসে।

না, কারো সাড়া নেই। অপারেটর জানিয়ে দিলো, টেলিফোন কেউ ধরছে না। বিবিসি'র কারো বাসায় ফোন করবো? টেলিফোন তুলেই মনে হলো, এতোক্ষণ ওরা হয়তো পথে, অফিসের দিকে।

ঢাকায় বকুলের কথা মনে পড়লো। ঢাকায় কি এখন কারফিউ? সব শান্ত, স্তব্দ, গোরস্তান? নাকি মানুষেরা পথে নেমে পড়েছে? নাকি মেশিনগানের গুলীতে আরো একবার ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে আমার ঢাকা শহর?

বঙ্গবন্ধুকে কে হত্যা করতে পারে? হত্যাকারী কি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে গুলী করেছিলো? কোথায় লেগেছিলো গুলী? ক'টা গুলী?

তাঁর লাশ কি এখনো পড়ে আছে যেখানে তিনি গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন? বকুলের ছবিটা চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো। তার শেষ চিঠিটা

মনে পড়লো। শেষ চিঠির শেষ লাইনে বকুল লিখেছিলো, 'আমি জানি, তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না। আমাকে তুমি কোনোদিনই বিয়ে করবে না। আমিও তার শোধ নেবো অন্য কাউকে ভালোবেসে। অন্য কাউকে বিয়ে করে। তুমি কি মনে করো, নতুন করে ভালোবাসা যায় না নতুন কাউকে?'

এ কথা স্বীকার যদি না করি, খুব পাপ হবে। বকুলকে আমি ভালোবাসি। বকুলের সঙ্গে ঘর করার স্বপ্ন দেখেছি সেই যখন একসঙ্গে আমরা দু'জন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। তারপর লন্ডনে প্রথম যেদিন স্বাদ পেলাম নারীদেহের, থর থর করে উঠলো ভিত, কালো একটা ঘোড়া যেন লাফিয়ে উঠলো বুকের ভেতরে, বকুল গেলো তার পায়ের চাপে পিষে।

তারপর থেকে অবিরাম দু'দিক থেকে দু'টো টান। এই নারী দেহ, ওই ভালোবাসা। এই মাংস, ওই মন। তখন মাঝে মাঝেই মনে হতো, আচ্ছা, দেহের যে স্বাদ তার চয়ে কি বড় স্বাদ ভালোবাসার?

বকুলকে কতোবার লিখতে চেয়েছি, বকুল, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। যাকে তোমরা নষ্ট হয়ে যাওয়া বলো, সেই নষ্ট। আর যদি বলো, আমি তোমার থেকে দূরে সরে গেছি, সেটা কিন্তু সত্যি বলা হবে না। আবার মনে হয়, এটাই বুঝি সত্যি এখন।

কিন্তু একথা লেখা আর হয়ে ওঠেনি বকুলকে। আমার চিঠিগুলো ক্রমে হয়ে এসেছে ছোট। বকুলের চিঠিগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। আমার চিঠিগুলো ছোট হয়ে আসছে, যেন শেষ পর্যন্ত এই একটি বাক্য লিখবার জন্যে যে, 'বকুল, তুমি আর আমার নও।' পারিনি। লিখতে পারিনি। গতকালও বাক্যটি লিখে ছিঁড়ে ফেলেছি এরোগ্রাম। বলতে পারিনি, 'তুমি এখন আমার অনেক দূরে, মহাদেশ দূর, হৃদয় দূর, সকল-দূর। দূর তুমি দূর।

লিখতে লিখতেও ভয় করে। বকুলের জন্যে নয়। নিজের জন্যে। ভয় করে, আমি কোথায় যাচ্ছি? কোথায়? আরো কোথায়?

আজ, এখন, এই সকাল বেলায় মনে হলো, বকুলকে সত্যি কথাটা লিখলে হয়তো আমার সম্মুখে একটা গাছও মরে যেতো না, মাটি দুলে উঠতো না, যেমন এখন যাচ্ছে, এখন উঠছে।

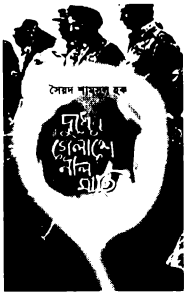

২

কোনোরকমে কফি করে ঘন ঘন চুমুকে শেষ করে চলেছি, শেষ হলেই বিবিসি'র দিকে বেরুবো, হঠাৎ মনে পড়লো আজ সকালে নিকি'র ওখানে যাবার কথা। নিকি আমার সেই নারী দেহ। নিকির দেহই আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বকুলের বিপরীতে। গেলো রাতেই নিকি'র সঙ্গে ঠিক হয়েছিলো যে সকালে যাবো, ওর লেখা নতুন কিছু কবিতা শুনবো, দুপুরে খাবো। তারপর, আগে যেমন বহুবার হয়েছে, বিকেলে কোনো ছবি দেখবো ওর সঙ্গে কিংবা হ্যাম্পস্টেডের বনে ঘুরে বেড়াবো ফিরে আসবো রাতে।

ফোন তুলে ডাকলাম, 'নিকি?'

'কোথায় তুমি?'

'বাসায়।

'বাহিরে যাইতেছ?

'হ্যাঁ তবে তোমার ওখানে আসিতে কিঞ্চিত দেরি হইবে।'

ইতস্তত করলাম একবার। নিকিকে বলবো শেখ মুজিবের কথা? যদি সত্যি না হয়? যদি মাহমুদের দেয়া খবরটা আগাগোড়াই একটা নির্মম রসিকতা বলে প্রমাণিত হয়?

'কেন? দেরি হইবে কেন?'

'বিবিসিতে যাইতে হইবে। আজ যাহার খবর পড়ার কথা ছিলো, তাহার হঠাৎ অসুখ। তাই আমাকে ডাকিয়াছে।'

স্পষ্ট টের পেলাম আমার গলা কাঁপছে, সেটা মিথ্যা বলার জন্যে নয়, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর জন্যে শূন্যতার বিকট শংকায়।

নিকি জানতে চাইলো খবর পড়া শেষ হবে কখন।

'বেলা তিনটায় বাহির হইতে পারিব। তখন সোজা তোমার ওখানেই আসিব। মধ্যাহ্ন ভোজ না হয় রাত্রিতেই হইবে?'

'উত্তম।'

'কেন? উত্তম কেন?'

আমি আসতে পারছি না বলে নিকি 'উত্তম' বলবে, এতে যেন কোথায় আমার একটা পরাজয়ের নিশান দেখতে পেলাম।

নিকি বললো, 'প্রভাতে পত্র পাইলাম প্রকাশকের। আমার নূতন কবিতার গ্রন্থ লইয়া কথা বলিতে চায়।'

গলায় জোর করে উৎসাহ আনবার চেষ্টা করলাম আমি। প্রযোজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম, 'প্রকাশ করতে রাজী হইয়াছে।'

'হাঁ, রাজি হইয়াছে।'

'খুশি, আমার খুব খুশি বোধ হইতেছে।'

'তাই ভাবিতেছি,আজই যাই দেখা করিতে। আমিই ভাবিতেছিলাম তোমাকে ফোন করিব না আসিতে। তোমারও দ্যাখো হঠাৎ কাজ পড়িয়া গেলো।'

'নিকি।'

'কি, বলো।'

'তুমি তো আর সারাদিন প্রকাশকের সঙ্গে থাকিবে না। আমি না হয় অপরাহ্নেই আগত হই।'

'কিছু তো ঠিক নাই। আচ্ছা, অপরাহ্নে ফোন করিও। যদি থাকি তো দেখা হইবে।'

'নিকি, শোনো। ফোন ছাড়িয়া দিও না।'

'অবিলম্বে আমার বাথরুমে না গেলেই নহে। তুমি অপরাহ্নে ফোন করিও। নূতন একটা কবিতা তোমাকে শোনাইবার জন্যে অস্থির হইয়া আছি। আইডিয়াটা তোমার নিকট হইতেই লওয়া।'

'কোন্ আইডিয়া?'

'দেখা হইলে বলিব। আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। রাখিতেছি।'

নিকির কি এখন সত্যি বাথরুমে পেয়েছে? না, আলাপ খাটো করার নেহাৎই একটা অজুহাত?

মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তবে কি নিকির বন্ধুত্বও হারালাম?

জানালার শার্সি খুলে মনে হলো, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মোটা পুলওভার পরে নিয়ে দরোজায় তালা দিয়ে বেরুলাম।

পথে, সত্যি শীত। কাল এতোটা শীত ছিলো না। এবারের আগষ্ট মাসটা এমনই উল্টো-পাল্টা যাচ্ছে।

বকুলকে কবে বলতে পারবো যে, কোনোদিনই ওকে আমি আর বোধহয় ভালোবাসি না। বলারও কোনো দরকার আছে কি? কি হয়, এভাবে সব ভেসে যেতে দিলে? বিশাল কালো জলের ওপরে? সামান্য এক ভেলায়? অচিহ্নিত গন্তব্যের দিকে? কি হয়? কি তাহলে হয়?

একদা এক সিংহের ছবি আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো। ঘন সবুজ জংগলের ভেতরে উৎসুক একটা মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। কোথাও শব্দ নেই, যেন সেই নিস্তব্ধতা ছুঁইয়ে পড়ছে ছবির বাইরে, আমাদের পৃথিবীতে। সিংহটা কিসের জন্যে উৎসুক হয়েছিলো? সে কি দেখতে পেয়েছিলো কোনো শিকারীকে? যার হাতে বন্দুক কিংবা বল্লম? সে কি একপল কৌতুকের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলো কিভাবে মৃত্যু আসে?

পরবাস লণ্ডনে মাটির তলা দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। গাড়ির ভেতরটা ভিড়ে ভর্তি। সকাল বেলার অফিসযাত্রী। চোখে মুখে এখনো তাদের ঘুমের ঘোর। এখনো কারো কারো নিশ্বাসে রাতের বাসীগন্ধ। বসার জায়গা হয়নি। দাঁড়িয়ে আছি। আমার সম্মুখের মেয়েটির ঝাঁপানো চুল থেকে মলিন মন্থর ঘ্রাণ। সরে না দাঁড়ালে আমার হয়তো বমি হয়ে যাবে। কিন্তু সরে দাঁড়াবার মতো জায়গাটুকুও নেই।

আসলে, আমার খুব অসুস্থ লাগছে। ছোটবেলায় জ্বর আসবার আগে আমি যেমন চোখের সম্মুখে ছোট্ট কিন্তু উজ্জ্বল একটা রামধনু দেখতে পেতাম, এখন সেই রামধনুটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে। জ্বরের ভেতরে শুয়ে থেকে রান্নাঘরে মায়ের হাতে মসুর ডালের ঘ্রাণ পেতাম, কর গুণতাম আর ক'দিন পরে ডাল দিয়ে চাট্টি ভাত খেতে পারবো।

অনেকদিন পরে আজ হঠাৎভাত ডাল খেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু খাবার কথা মনে হতেই বেড়ে উঠলো বিবমিষা, পেটের ভেতরে পাকিয়ে উঠলো সকালবেলার কফি। বিবিসি বুশ হাউসে নামবার স্টেশন হোবর্ণ। এখনো একটা স্টেশন বাকি। তবু নেমে পড়লাম। গাড়িতে থাকলে একটা কেলেংকারি হয়ে যেতো।

লেস্টার স্কোয়ার থেকে বুশ হাউস মাইলখানেক পথ। এটুকু হেঁটেই যেতে পারবো। বাইরে বেরিয়ে বরং অনেক ভালো লাগলো। অনেক স্বচ্ছন্দ, অনেক মুক্ত।

আমার চারদিকে কতো লোক। লেস্টার স্কোয়ার ভরে গেছে কতো দেশের ট্যুরিষ্ট দিয়ে। আমার মতো আর কার দেশে এতো অনিশ্চয়তা এই মুহূর্তে? আজকের এই অমল রোদ্দুরের দিনে? অমিত এই বন্যার ভেতরে?

না, নিজেকে করুণা করতে নেই।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে পায়রার ঝাঁক। বাকবাকুম করছে, দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, কাঁধে এসে বসছে কারো। ছবি তুলছে এ ওর, পায়রার ভিড়ের ভেতরে। একবার বঙ্গবন্ধুকে দেখেছিলাম জনসভায়। একে একে ছ'টা পায়রা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন আকাশে। সেদিনও রোদ্দুর ছিলো আজকের মতো। কিন্তু আজ তিনি নেই।

তাঁর রক্তাক্ত লাশ কি এখনো পড়ে আছে মাটিতে? নাকি মাটি দেয়া হয়ে গেছে এতোক্ষণে? কি করছে ঢাকার মানুষ কারফিউয়ের ভেতরে?

সিংহের চোখে উজ্জ্বল কৌতুক আমি একদা দেখেছিলাম।

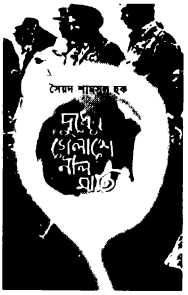

৩

বিবিসি'র বাংলা বিভাগে ঢুকে দেখি প্রযোজক সকলেই প্রায় এসে গেছেন, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এ ঘর ওঘর করছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে থেকে বিস্তারিত কিছুই জানা গেলো না। কিংবা, আমি এখানে কাজ করি না বলেই তাঁরা আমাকে এমন কিছু জানালেন না যা আমি ইতিমধ্যেই জানি না।

কেবল এটুকু জানা গেলো, শেখ মুজিব সত্যি সত্যি নিহত। তাঁর পরিবারের সকলেই নিহত। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়। খন্দকার মুশতাক নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। আর বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে পাকিস্তান, তার কিছু সময়ের ভেতরেই সৌদি আরব। ঢাকা শান্ত।

বাংলাদেশ বেতার থেকে খন্দকার মুশতাকের কণ্ঠ।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম।

আসসালামু আলায়কুম,

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দানের পূতঃ দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে সরকারেরর দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মত অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

দেশের শাসন ব্যবস্থার বিবর্তন সর্বমহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে

এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরমতম নিষ্ঠার সংগে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন।

নিচে ক্যান্টিনে এসে এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসলাম। একা।

বাংলা সংবাদ এখান থেকে প্রচারিত হবে দুপুর পৌনে তিনটেয়। তার আগে, বিভাগ থেকে বিস্তারিত কোনো খবর যে আমি পাবো না, তা নিশ্চিত। আমাকে এই ঘন্টা পাঁচেক এখানেই অপেক্ষা করতে হবে উৎকণ্ঠিত হয়ে।

এ পেয়ালা শেষ হলে আরেক পেয়ালা নিলাম।

আমারই মতো এখানে মাঝে মাঝে খবর পড়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কণ্ঠ দেয় আইনের ছাত্র আলমগীর। তাকে দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে কফি নেবার জন্যে লাইনে দাঁড়াতে।

কফি নিয়ে সে আমাকে দেখতে পেলো। দেখেই এসে বসলো আমার টেবিলে।

'এসে গেছেন?'

উত্তরে আমি একটু হাসলাম।

আলমগীর এক চুমুকে অনেকখানি কফি শেষ করে, ঠকাস্ শব্দে পেয়ালা নামিয়ে, দ্রুত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'এখন কি হবে বলুন তো?'

আমি জানি, আলমগীর শেখ মুজিবকে কখনোই পছন্দ করতো না। এই মুহূর্তে সে আমাদের শেখ মুজিবের অনুচর হিসেবে সনাক্ত করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললো, 'আপনাদের আমি বার বার বলেছি, শেখ যে পথে এগোচ্ছে সে সর্বনাশের পথ। দেশটাকে সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো একবার ভেবে দেখেছেন? বলুন?"

তার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'কখন খবর পেলেন?'

'পেয়েছি সকালে।'

তখনো আলমগীরের চোখ থেকে ক্রোধ যায়নি। তাকিয়ে রইলো সে আমার উত্তরের অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরে উত্তরের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথায় গেলো। জানালো, 'জানেন, লণ্ডনে প্রথম খবর পায় কে?'

'না।'

'জানেন না? তাহলে আর কি জানেন? প্রথম খবর পায় পাকিস্তানী এক সাংবাদিক। পাকিস্তান থেকে রাতে তার কাছে ট্রাংকল আসে। শেখ নিহত হবার পর পরই। এটা কি করে সম্ভব বলতে পারেন, যদি না পাকিস্তানীদের হাত থাকে এর পেছনে? আমি তো বলি, পাকিস্তানই শেখকে হত্যা করেছে। ভুট্টোরই কাজ এটা।'

'আপনি ঠিক শুনেছেন?'

'একথা আর লুকোনো নেই। সকলেই জানে। পাকিস্তানী সেই সাংবাদিক রাত দুপুরেই কয়েকজনকে ফোন করে জানায়। তার পরে তো বিবিসি থেকে খবর হলো।'

'ওপরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। শুনলাম, মেজর ডালিম নামে একজন রেডিওতে শেখ হত্যার ঘোষণা দিয়েছে। খন্দকার মুশতাককে সামরিক বাহিনী সাক্ষী গোপাল দাঁড় করিয়েছে। শফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ মোশাররফ এদের কি ভূমিকা তা এখনো জানা যায়নি। যাই হোক, আজ বিকেলে কি করছেন?'

'আজ বিকেলে?'

'হ্যাঁ। লণ্ডনের কয়েকজন বাঙালী যাঁরা রাজনীতি করেন, আজ বিকেলে এই ক্যান্টিনে বসবেন দেশের অবস্থা আলোচনা করতে। থাকবেন?'

'আমি?'

'এককালে তো রাজনীতি করতেন।'

'করতাম। আচ্ছা দেখবো। বিকেলে তো? এখানে?'

'হ্যাঁ এখানে। আমাদের সকলে বসে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে দেখা দরকার। ঠিক করা দরকার, আমাদের কি কর্তব্য। হাজার হোক নিজের দেশ, তাকে তো আর ভেসে যেতে দেয়া যায় না।'

'না, নিশ্চয়ই না।'

আলমগীর সরু চোখে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠিক বুঝতে পারলো না আমি ঠাট্টা করছি কি-না। কি সিদ্ধান্ত করলো সে-ই জানে, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'আচ্ছা, তাহলে বিকেলেই দেখা হবে।'

আরো কফি নেবো?

না, এভাবে এখানে একা বসে থাকা অসম্ভব। না কফি, না সিগারেট, না একাকীত্ব, কিছুই আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। অথচ, খবরটা প্রথম শোনার সময়ে যে ধাক্কা পেয়েছিলাম, তাও এখন আর নেই। এখন সেই শংকা, সেই অবিশ্বাস, সেই শূন্যতা, সমস্ত কিছুরই ধার ভোঁতা হয়ে গেছে। কেবল রক্তের ভেতরে বোধ করছি একপ্রকার অস্থিরতা, কোথাও যাবার জন্যে ব্যাকুলতা, কারো সঙ্গে বসে রাজনীতি নয়, অন্য কোনো তুচ্ছ বিষয়ে কথা কাইবার, আড্ডা দেবার টান।

ক্যান্টিন থেকে আবার গেলাম পাঁচতলায় বাংলা বিভাগে।

'নতুন কোনো খবর আছে?'

'না তবে শেখ যে নিহত, এটা পাকা খবর।'

আসলে, বারবার এই একটি কথাই এখন প্রত্যেককে নিজের জিহ্বায় উচ্চারণ করে নিজেরই কানে শুনে নিতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যে নিহত হবেন, তাও বাংলাদেশে, বাঙালীরই হাতে, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য খবর একটি মানুষ জীবনে একটি কি দু'টির বেশি দেখাতে পারবে না। তাই প্রত্যেককে, আজ সকালে,

বারবার বলতে হচ্ছে, যতোটা না অপরের জন্যে, তার চেয়ে বেশি নিজের জন্যে যে, শেখ মুজিব আততায়ীর বুলেটে নিহত।

আমার মনে পড়ে গেলো, আগরতলা মামলার কথা। শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা এবং স্বাধীন করতে চাইছেন, আইয়ুব খানের সাজানো এই মামলায় আমাকে সরকারী সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন ছাত্র রাজনীতি করতাম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো কুর্মিটোলার সেনানিবাসে। সেখানে আটক রাখা হয়েছিলো। সেখানেই তো বকুলের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত। বকুলের বাবা ছিলেন সেনা বিভাগের গোয়েন্দা অফিসার। আর বকুলই তার বাবাকে বলে ছাড়িয়ে এনেছিলো আমাকে। পরে শুনেছি, বকুলের কাছে শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে বক্তৃতা দিতে দেখে আমাকে নাকি সে ভালোবেসে ফেলেছিলো।

আগরতলার ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার পর, তখনো জানি না আমার মুক্তির পেছনে ছিলো বকুল, বকুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আর জানতে পারি যে, বকুল না থাকলে আমাকে এ মামলায় সাক্ষী কিংবা আসামী দু'টোর একটা হতেই হতো।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিলো আমার হৃদয়। কিন্তু মুর্খের মতো বকুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর বিনিময়ে তাকে আমি কি দিতে পারি?

'তোমার ভালোবাসা। আমি তোমার বৌ হতে চাই।'

তখন মনে হয়েছিলো, বকুলের জন্যে বিয়ে করা কেন, আমার জীবন পর্যন্ত তাকে দিতে পারি। অর এখন আমার সেই জীবন, সেই অস্তিত্বকেই আমি বড় মনে করে বকুলের থেকে দূরে আছি। এখন আমি জানি যে আমি এক কাপুরুষ। মিলিটারির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আরো ভালো করে রাজনীতি করার বদলে রাজনীতি আমি একেবারেই ছেড়ে দিই। ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় শেখ মুজিব নিজে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে। কিন্তু আমি তা ফিরিয়ে দেই। তারপর, বাংলাদেশ হয়ে যাবার পর, শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রপতি হবার পর, দেশে যখন কোনো রাজনৈতিক দলে না থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়লো, তখন আমি পড়াশোনার নাম করে পালিয়ে আসি লণ্ডনে। আর সেই থেকে লণ্ডনে।

বকুল ভালো আছে তো? আমি তাকে ভালোবাসা দিতে না পারলেও, তার কোনো অকল্যাণ আমি ভাবতে পারি না। আগরতলা মামলার সাঁড়াশি থেকে আমাকে ছাড়াতে সে এবং তার বাবা কম বড় ঝুঁকি নেননি।

কৃতজ্ঞতা? অসম্ভব ভালোবাসার বিকল্প কৃতজ্ঞতা হতে পারে না।

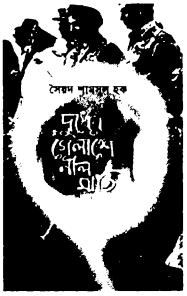

৪

'কি ভাবছেন?'

তাকিয়ে দেখি বাংলা বিভাগের অন্যতম প্রযোজক সৈয়দ শামসুল হক। ঠোঁটে তাঁর অনিবার্য সিগারেট। মাথায় তাঁর টাক ঢাকতে ব্যর্থ একগোছা চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। আমি এতোক্ষণ তাঁরই টেবিলের পাশে বসে ছিলাম।

সৈয়দ হক বললেন, 'আমি কি করে খবর পাই জানেন? আমার স্ত্রী ডাক্তার, স্কটল্যাণ্ডে কাজ করেন, সেই ভোরবেলায় তাঁর টেলিফোন। তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম। স্কটল্যাণ্ডের বাঙালী ডাক্তারেরা আমার স্ত্রীকে ধরেছেন, পুরো খবরটা স্বামীর কাছ থেকে জেনে দিন। অথচ আমিই জানি না। সেখানে তো মনে হলো বাঙালীরা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, ঘাবড়াবার কথাই তো।'

'এরকম একটা খবরের জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলাম না।' সৈয়দ হক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অথচ জীবনের শিক্ষাই এই যে, কোনো কিছুতেই অবাক হতে নেই।'

'অনেকেই কিন্তু মনে করতেন, শেখের ভাগ্যে এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পরিণতি ছিলো না।'

'অবাক কাণ্ড, পাকিস্তানীদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন, বাঙালীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন না।'

'হয়ত এটাই ভালো হয়েছে।'

'কি আর ভালো? ধরুন, তাঁর হত্যার পেছনে আন্তর্জাতিক কোনো চক্রান্ত যদি থেকে থাকে? তাহলে? শেখের হত্যা তো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হতে পারে না। তা যদি না হয়, বাংলাদেশের কি হবে ভবিষ্যতে, ভেবে ওঠাও মুশকিল।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন নীতির ও সমর্থনের তোয়াক্কা না রেখে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

সরাসরি বিরোধিতা ও শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে লটকানোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিবের স্বদেশে প্রত্যাবতর্ন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 'ক্লায়েন্ট' পাকিস্তানের জন্য প্রকৃত পরাজয়। এবং মার্কিন প্রশাসনের নিকট এটি ছিল বড় রকমের বিড়ম্বনা।

ব্যক্তিগত চরিত্রে কিসিঞ্জার ছিলেন অত্যন্ত 'ভিন্‌ডিকটিভ' প্রকৃতির। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তিনি ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদেশের মূল ও ভারী শিল্পসমূহ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি জাতীয়করণ করলেন। ব্যক্তিপুঁজির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে গণমানুষের স্বার্থে পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করলেন। একই সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি যা বললেন তা আরো মারাত্মক। বললেনঃ পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত ঋণের বোঝার দায় দায়িত্ব তিনি নেবেন না। ঢাকায় সফররত বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলকে ডেকে বললেনঃ ভদ্র মহোদয়গণ, শর্তযুক্ত ঋণের কথা বললে আপনারা যেতে পারেন। বললেনঃ তৃতীয় বিশ্বের শোষণের কথা। বললেনঃ শোষণ বন্ধের কথা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় বিশ্বব্যাপী সোচ্চার হলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখলঃ মুজিব আর তাদের লোক নন। সুতরাং কিসিঞ্জারের নীতি হল-'গেট আওয়ার পিপল ইন এন্ড দেয়ার পিপ্‌ল আউট।' সি, আই-এর খেলাই হল 'গেট ইন্‌' আর 'গেট আউটের' খেলা। কিসিঞ্জার আরো মনে করতেন শেখ মুজিব জীবিত থাকলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন নীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীণ হবে। কথাটার যথার্থতা ছিল। বাংলাদেশই প্রথম রাষ্ট্র যে মার্কিন প্রভাব বলয়কে উপেক্ষা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি প্রগদান করেন এবং বাংলাদেশে তাদের মিশন খুলবার অনুমতি দেয়। বঙ্গবন্ধু পি, এল,ও, কে মিশন খোলার অনুমতি প্রদান করেন এবং একই সঙ্গে ইসরাইলের মিশন স্থাপনের জন্য মার্কিন মৌন ইংগিতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, আলজিয়ার্স-এ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীণ ঘোষণা, প্রকৃত পক্ষেই দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন বিদেশী নীতির প্রতি বঙ্গবন্ধু হয়ে দাঁড়ান 'জলন্ত থ্রেট'। ফিদেল ক্যাস্ট্রো যেমন ল্যাটিন আমেরিকায়, মুজিব তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক সার্বক্ষণিক 'সমস্যা' হয়ে দাঁড়াবে। এটাই ছিল সি, আই-এর এসেস্‌মেন্ট।

এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। তাছাড়া জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর দুই পৃথিবীর তত্ত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুণলো। বঙ্গবন্ধু ঐ সম্মেলনে ভাষণে বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' সেই ভাষণের পর পরই ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আজ থেকে একটা বুলেট অহরহ তোমার পিছু নেবে। ক্যাস্ট্রো ব্যতীত ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু চারিদিকে তখন মহাবিপদ সংকেত।

প্রচণ্ড দাবদাহ.....জমির ফসল পুড়ে গেল। পর পরই আকাশ ভেঙে নামল অবিরাম বর্ষা। হ'ল বন্যা। দেশ ডুবল, ফসল ডুবল। ডুবল ঢাকা শহর। বঙ্গবন্ধু থমকে দাঁড়ালেন। মানুষকে বাঁচাতে হবে। অথচ তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে রাজকোষ শূন্য। মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীর সর্বত্র আঘাত হেনেছে। বেশি আঘাত করল যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত বাংলাদেশকে। এরই মধ্যে খরা আর বন্যা। বাংলাদেশ মহাসংকটে। বঙ্গবন্ধু ভাবলেন। সুর নরম করলেন। শিল্প বিনিয়োগের সিলিং বাড়িয়ে দিলেন। বিশ্ব ব্যাংক বললঃ টাকার দাম কমাও। বঙ্গবন্ধু নিরন্ন জনগণকে বাঁচানোর স্বার্থে টাকার অবমূল্যায়ন করলেন। রেশনের দাম বাড়ালেন। বেসরকারি মালিকানায় শিল্প প্রত্যাবর্তন পুঁজি প্রত্যাহারের নীতি বিবেচনা করে দেখলেন। দেশের ভয়াবহ অবস্থা দেখে এই প্রথম বারের মত শেখ মুজিব ভেঙ্গে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ালেন দ্রুত। ছুটলেন ওয়াশিংটনে।

কিসিঞ্জার ঢাকায় এলেন।

তাজউদ্দিনের বিদায় পর্ব সমাপ্ত হল।

মনে হল বঙ্গবন্ধু মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। নতজানু আত্মসমর্পিত.....পরাজিত সিপাহসালার। আসলে কি তাই?

বঙ্গবন্ধু কোনদিন পরাজয়ের পরাভবকে মেনে নেননি। দুর্ভিক্ষে মার্কিনদের বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা তাঁর মনে বড় রকমের দাগ কেটে গেল। বঙ্গবন্ধু আঘাত সামলে নিলেন। সাতাশ হাজার বুভুক্ষু লোকের লাশ, বিবেক দংশনে অহরহ জর্জরিত তিনি।

পথ খুঁজতে লাগলেন।

মুক্তির পথ কোথায়? সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়ার মন্ত্র আবিষ্কারে তিনি ব্যস্ত। যেমন বাঙালীর জাতীয় স্বাধীনতার জন্য

তিনি প্রণয়ন করেছিলেন ৬ দফা কর্মসূচী এবারও তাকে মুক্তির লক্ষ্যে দিতে হবে কর্মসূচী। বঙ্গবন্ধু পথ অন্বেষায় অস্থির.....

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সি, আই-এর। এসেমমেন্ট অত্যন্ত নির্ভুল ছিল। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের ক্রান্তিলগ্নে শেখ মুজিবের মার্কিনীদের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং কতিপয় গ্রহীত কার্যক্রমকে পেন্টাগন সংকটজনক অবস্থার সাময়িক প্রবনতা বলে চিহ্নিত করলেন। তাদের ধারণা ঃ

Mujib's concessions were, in a sense, a desperate reaction to the crisis, not a firm commitment to the principle, and not necessarily a position a patron would bank on the future. বাংলাদেশে অত্যন্ত সংগোপনে সি, আই, এ, তার পরিকল্পনা মাফিক এগুতে থাকে।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ফিলিপ চেরী ১৯৭৪ সনের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে সি, আই-এর স্টেশন চীফ হিসেবে ঢাকায় বদলী হয়ে আসেন। ১৯৭১ সনের মার্চে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। উপমহাদেশে সংকট ঘনীভূত হল। বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। এমন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিল্লী কলকাতায় সি, আই-এ এর নেটওয়ার্ক যখন আরো বিস্তৃত করছিল তখন ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসে, কিসিঞ্জারের আগমনের ও তাজউদ্দিনের বিদায়ের দুই মাস পূর্বে সি আই-এ আরো বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। ঢাকায় কিসিঞ্জারের সফরের সময় মুজিব হত্যার গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে সিআইএ নেট ওয়ার্ক অবিলম্বে তাদের পুরনো কনট্রাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

এই যোগাযোগ পেতে তাদের বিলম্ব হয়নি। কেননা বাংলাদেশে তাদের যেসব পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন মাহবুব আলম চাষী তাদের অন্যতম। মাহবুব আলম চাষী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাকের অধীনে পররাষ্ট্র সচিবের পদে কাজ করেছিলেন। সিআই-এর সঙ্গে তার যোগসাজশ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাকে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব ঐ পদ থেকে অপসারিত করেন। দেশ স্বাধীন হলে মাহবুব আলম চাষী প্রধানতঃ মার্কিন সাহায্যে পরিচালিত সংস্থা কুমিল্লার বার্ডে যোগদান করেন। সি. এস. পি. অফিসার হিসেবে চাকরীর প্রথম ধাপেই তিনি পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনের একজন অফিসার হিসেবে ওয়াশিংটনে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধে তার ভূমিকা পাকিস্তানের চেয়ে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং সি, আই-এর রিক্রুট হিসেবে কাজ করার ঘটনা

প্রমাণিত হলে ১৯৬৭সনে তাকে চাকরী হারাতে হয়। চাকরীচ্যুতির অভিযোগ ছিল "He is too pro-American even for Pakistan."

১৯৭১ সনের এপ্রিল।

মোশতাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর মাহবুব আলম চাষী পররাষ্ট্র সচিব।

১৯৭৫ সনের আগষ্ট, মোশতাক প্রেসিডেন্ট আর চাষী প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী।

আর মাঝখানে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ফিলিপ চেরী বাংলাদেশের সি-আই-এ স্টেশন চীফ।

আসলে লিফস্যুজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চেরী মুজিব হত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক অস্বীকার করলেও একথা স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭৪ সনের শেষ দিকে মুজিবকে উৎখাত করার প্রস্তাব নিয়ে তাদের 'এপ্রোচ' করা হয়েছিল।

প্রকৃত ঘটনা, পূর্ব পরিচয় ও বন্ধুত্বের কারণে ফিলিপ চেরী ব্লুপ্রিন্ট মোতাবেক চাষীকে কাজে লাগায়। চাষী গোপনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। জিয়াউর রহমান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। এই স্তরে জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে মোশতাক গ্রুপ মেজর রশীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

খোন্দকার মোশতাক আহমদের ভাগিনা মেজর রশীদকে সহজেই হাত করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, মেজর রশীদের ভায়রা হল মেজর ফারুক রহমান। মেজর ফারুক রহমান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার পরিবর্তনে তাদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়।

সৈয়দ হক একটা সিগারেট থেকে আরেকটা ধরালেন। আমাকেও দিলেন।

বললাম, 'একটা ফোন করতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

কাল রাতে ঘুমোতে যাবার সময় যার মুখ মনে পড়েছিলো, ঘুমের অন্ধকারে যার মুখ অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে দেখছিলাম, তার কথা এখন আবার আমার মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আমার এরকমই হয় বরাবর। মৌনাকে টেলিফোন করার আগে প্রতিবারই দ্বিধা এসে আমাকে দংশন করে।

এখনো, টেলিফোন হাতে নিয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম। ফোন করবো? না, করবো না? করবো নাই বা কেন? আজ তো একটা প্রসঙ্গ আছে, শেখ মুজিব নিহত, সেই খবরটা দেবার অছিলায় মৌনাকে আমি স্বাভাবিকভাবেই ফোন করতে পারি।

দ্বিধা হয়তো আমার চোখে ফুটে উঠেছিলো। সৈয়দ হক বললেন, 'আপনি ফোন করুন, আমি আসছি।'

তিনি হয়তো ভেবেছেন, ব্যক্তিগত ফোন বলে তার সম্মুখে কথা বলতে ইতস্তত করছি। সৈয়দ হক যেতে যেতে বললেন, 'ভালো কথা, মাহতাব। আমার একটা অনুষ্ঠানে গলা দিতে হবে। কাল বিকেল পাঁচটায় রেকর্ডিং। সাড়ে চারটার দিকে আসতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারবো।'

সৈয়দ হক চলে গেলেন। আমি মৌনার নম্বর ডায়াল করলাম; তার আফিসের নম্বর। বারোটায় ওদের লাঞ্চের ছুটি। এখনো বারোটা হতে দশ মিনিট বাকি, নিশ্চয়ই বেরিয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ ধরে বেজে চললো টেলিফোন। কেউ তুলছে না। মৌনা কি দশ মিনিট আগেই লাঞ্চে বেরিয়ে গেলো? নাকি, আজ অফিসে আসেনি?

'হ্যালো।'

মৌনার কণ্ঠস্বর। তার নিশ্বাস দ্রুত, স্বর কিছুটা উত্তেজিত।

'আমি মাহতাব।'

'ও আপনি?'

মৌনার গলায় কি আমি মৃদু হতাশার নিশ্বাস শুনতে পেলাম? মনে হলো, ফোন না করলেই ভালো ছিলো।

'অনেকক্ষণ ফোন বাজছিলো। ভাবলাম অফিসে আসোনি।'

'তা বৈকি। অফিসে না এলে হয়? পাশের ঘরে ছিলাম, এই তো ছুটে এসে ধরলাম।'

'খবর শুনেছো?'

'কি খবর?'

'শেখ মুজিবের।'

'হ্যাঁ, সৌমেন ফোন করে জানালো।'

'সৌমেন কোথায়? পাস করেছে?'

'বারে, সেদিন বললাম না, পাস করেছে।'

'অনেকদিন কষ্ট করে, চাকরি করে, তাহলে পাস করাতে পারলে ওকে।'

'কষ্ট আবার কি? তাছাড়া স্বার্থ ছিলো যে।'

'কি রকম?'

'এখন ও কাজ করবে, আর আমি বাসায় বসে থাকবো, জমিয়ে ঘরকন্না করবো।'

'ছেলে-মেয়ের মা হবে।'

'হতেও পারি বারে, ছেলেমেয়ে হবে না নাকি?'

'আচ্ছা মৌনা, তোমার অফিসের ফোন আর বেশিক্ষণ ব্যস্ত রাখছনি। একটা কথা ছিলো। বাসায় ফিরছো কখন?'

'সাড়ে পাঁচটায় বেরুবো। পৌঁছুতে পৌঁছুতে ছ'টা সোয়া ছ'টা। কেন?'

'আজ গেলে খেতে দেবে?'

'দেবো না কেন? ডাল ভাত যা আছে খাবেন। কখন আসছেন?'

'ধরো সাতটা নাগাদ। অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় না। সৌমেন পাস করলো, নিজ মুখে কংগ্রাচুলেটও করা হয়নি। সাতটায় আসবো, কেমন?'

'আচ্ছা।'

এরপরেই ফোন রেখে দেবার কথা কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম এক মুহূর্ত। যেন, যে কথাটা বলতে চাই, তা বলা, আমার বারণ। কিন্তু কি সাধারণ কথা।

বললাম, 'তুমি ভালো আছো তো, মৌনা?'

'হ্যাঁ, আছি।'

'সব ভালো?'

'সব ভালো।'

'আর কিছু?'

মৌনা যে স্বরে বললো, 'সব ভালো' বুকের ভেতরে বাজলো। এ বাজা সুখের নয়। কষ্টের নয়। অপমানের। মনে হলো, মৌনা আমাকে ঠাট্টা করছে।

একেক সময় আমার যে মনে হয়, কিছুদিন থেকেই মনে হয়, মৌনাকে যদি নিকির মতো কাছে পেতাম, অঙ্গে পেতাম; এটা কি টের পেয়েছে মৌনা? এটা কি ফুটে উঠেছে আমার চোখে? আমার মুখে? কিংবা গায়ের ঘ্রাণে?

শুনেছি পুরুষ যখন কোনো নারীকে চায় তখন নাকি পুরুষের দেহ থেকে বেরোয় এক ঘ্রাণ। সে ঘ্রাণ কেবল কাঙ্খিত নারীটিই পায়। নারীটিই বোঝে। নিকির কাছে এই তথ্যটি আমি প্রথম পাই।

সে রাতের কথা এখনো মনে আছে।

গভীর রাতে ঝিম মেরে আছে কিলবার্ন পাড়া। কেবল মাঝে মাঝে একটি দু'টি গাড়ি। ঝকঝক করছে সাইনবোর্ডের আলো। ভূতের ইশারার মতো কুয়াশার ভেতরে কোথায় একটা নীলচে বাতি।

গাড়িতে ছিলাম আমি আর নিকি।

নিকি বললো, 'কোথায় নামিবে?'

আমি চুপ করে ভাবছি। কবিতার একটা লাইন এসেছিলো মাথায় সেই সন্ধ্যা থেকে। ভাবছি। দুধের গেলাশে নীল মাছি।

হঠাৎ মনে হলো নিকির আর আমার মধ্যে দুধ, তার দিকে ধেয়ে আসছে সেই মাছি, সেই নীল মাছি।

আমি চুপ করে আছি দেখে নিকি বললো, 'তোমার বাড়িতেই?'

হেসে বললাম, 'অতদূরে আমার বাড়িতে নামাইয়া দিতে কষ্ট হইবে, নিকি? তবে বুঝি পথেই নামিয়া যাইতে।'

নিকি হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত রেখে বলেছিলো, 'মাহতাব, একটা কথা বলি তোমাকে। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করিব না। আজ রাতে আমাকে তুমি চাহ্ নয়?'

চমকে ছিটকে পড়লাম নিকির কথা শুনে। এ কেমন মেয়ে?

মনটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখতে পায়।

নিকি বললো, 'কিন্তু আজ নহে। যতোই তোমার ইচ্ছা থাকুক না কেন, একার ইচ্ছায় শয্যা লওয়া যায় না।'

তারপরে যেদিন আমরা নিয়েছিলাম এক শয্যার আশ্রয় এক বরফ পড়া কনকনে রাতের ভেতরে, নিকি বলেছিলো, 'সেই রাত্রে তোমার ঘ্রাণে আমি জানিয়াছিলাম আমাকে তুমি চাহিয়াছিলে।'

টেলিফোনের ওপাশ থেকে খোঁচা দিয়ে মৌনা বলে, আবার বলে, 'কি চুপ করে আছেন যে, আর কিছু?'

নিঃশ্বাস পড়ে আমার। বুকটা ফাঁকা হয়ে যায়। চোখের ভেতর নিকি নাচে।

বললাম, 'আর কিছু'?

'আবার কি? কিছু না।'

'তাহলে ভালো আছো?'

'বারে, ভালো থাকবো না কেন?'

'না, এমনই জানতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন আছো না আছো। আচ্ছা, এখন রাখি। আজ মনটা খুব খারাপ। তোমাদের ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আসবেন।'

'সাতটায়। রাখি তাহলে।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরও অনেকক্ষণ মৌনার কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতির ভেতরে চলাচল করতে লাগলো। কি হয় আবার ফোন করলে?

করলাম।

ওপার থেকে মৌনার গলা।

'হ্যালো।'

নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে দিলাম। দ্বিতীয়বার ফোন করার কোনো যুক্তিই আমি মৌনাকে দিতে পারবো না। এমনকি শেখ মুজিব নিহত হবার জের টেনেও না

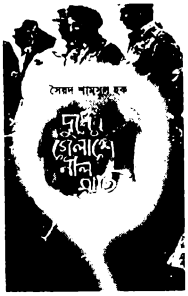

৫

নিকিকে ফোন করলাম। জানি, বাসায় থাকবে না। নিকি এখন প্রকাশকের সঙ্গে। তবু ফোন করলাম। একটানা বেজে চললো, কেউ তুললো না। কি হয়, ফোন যদি এভাবে লাগিয়ে রেখে দি, আর সারাদিন ধরে নিকির ফোন বাজতে থাকে ? সারাদিনই কি বাজবে?

না, কিছুক্ষণ পর আপনা থেকেই কেটে যাবে? কিংবা কেটে দেবে অপারেটর? সৈয়দ হক এসে বললেন, 'ফোন হলো? কাল তাহলে রেকর্ডিংয়ে আসছেন।'

'হ্যাঁ, আসছি।'

'আজ তো আপনার কোনো কোজ নেই এখানে?'

'না। বঙ্গবন্ধুর খবরটা আজ আমি পড়তে পেলে মন্দ হতো না।'

'কেন?'

বললাম, 'একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্ত হবার খবরটা আমিই পড়েছিলাম কিনা। এখনো স্পষ্ট মনে আছে। খবর পড়ছি, জেনারেল নিয়াজী কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করবে না। মানেকশ' আবেদনের পর আবেদন করে চলেছেন। হঠাৎ স্টুডিওতে নিউজ রুম থেকে তিন লাইনের একটা খবর কে নিয়ে এলো হাতে করে, হাঁপাতে হাঁপাতে। হাতে নিয়ে, ইংরেজী থেকেই মুখে মুখে বাংলা অনুবাদ করে পড়ে গেলাম-জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হয়েছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ বাংলাদেশের পক্ষেই শেষ হচ্ছে।'

ওয়াশিংটন পোস্ট। ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বরঃ এদিকে বাঙালিরা হর্ষোৎফুল্ল আনন্দ ধ্বনি করে চলেছে, আর অন্যদিকে আজ ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করল।

মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে সংযোগকারী ব্রিজে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি গেরিলাও বিদ্যুৎ গতিতে সেখানে উপস্থিত হয়। এর পরেই খবর এল যে, আত্মসমর্পণে তাঁরা সম্মত হয়েছে।

জেনারেল নাগরা বলেন, তিনি স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে আটটায় পাকিস্তানী মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে সংবাদ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেয়েছেন যে, পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে আর কোন প্রতিরোধ হবে না। এর পরেই তিনি লোক লস্করসহ শহরে প্রবেশ করেন।

এরপরে তিনি ইষ্টার্ণ কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকবকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ঢাকা বিমান বন্দরে উপস্থিত হলেন। জেনারেল জেকব কোলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে এলেন। এসময় বিমান বন্দর রক্ষায় নিয়োজিত পাকিস্তানী সৈন্যরা রানওয়ের আর এক প্রান্তে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলো।

আজ সকাল থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত রাস্তায় ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচল হয়েছে। ইতস্ততঃ গোলাগুলির খবরও পাওয়া গেছে। এতে জনকয়েক ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে একজন ভারতীয় অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বেসামরিক লোকদের সঙ্গে মিশে যেয়ে হৈ চৈ করছে, আর মাঝে মাঝে বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে আকাশের দিকে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। এদিকে উত্তেজনার মধ্যে অহেতুক গোলযোগের আশংকায় মেজর জেনারেল নাগরা কালবিলম্ব না করে ৯৫তম মাউন্টেইন ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লারকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাঠিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে এই হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী নাগরিক ও প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারী আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার ক্লার রাস্তার প্রচণ্ড ভিড় অতিক্রম করে অনেক কষ্টে হোটেলে যেয়ে উপস্থিত হলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ব্রিগেডিয়ার ক্লারকে সংগে করে উত্তর দিক থেকে মেজর জেনারেল নাগরা ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে অনেক ক'টা ছোট বড় লড়াই-এর পর ঢাকার দিকে এগিয়ে আসেন। এঁদের সংগে দুই ব্রিগেডের কিছু বেশি সৈন্য ছিল। প্রতিটি শহরে যুদ্ধ করে এঁদের প্রায় ১৬০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে। কখনও পায়ে হেঁটে আর কখনও বা গরুর গাড়ির সহায়তা নিতে হয়েছে।

হেলিকপ্টার থেকে জেকব অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনাকয়েক বেসামরিক বাঙালি দৌড়ে এলো। একজন মাথাটা পিছনে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে

বিদেশী সাংবাদিকদের একজনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোন্ দেশের লোক?' জবাব এলো 'আমেরিকা'।

বাঙালি প্রশ্নকর্তা মাটিতে থুথু ফেলে করমর্দন করতে অস্বীকার করে বললো, 'আমরা মার্কিনীদের উপর খুবই নারাজ।'

প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের সময় বরাবর কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করায় এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে পাকিস্তানকে মদদ দেয়ায়, বাঙালিরা যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করছে।

নাগরার একজন সহকর্মী একটা বাংলাদেশের পতাকা এনে উড়িয়ে দিলো। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মেজর জেনারেল জেকব। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে যে দিকে তাকাচ্ছি বাড়িঘর, গাড়ি সর্বত্রই শুধু বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আর রাস্তায় জনতার ঢল নেমেছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

রাস্তার দু'পাশের কিনার ধরে পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্য ও পুলিশের দল সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে কুর্মিটোলার দিকে। এদের সবারই কাছে অস্ত্র রয়েছে। কুর্মিটোলার একটা নির্দিষ্ট স্থানে এনে এঁদের নিরস্ত্র করা হবে।

স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ হলো। তখন চারদিকে চলছে গগনবিদারী চিৎকার আর মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের অস্ত্র থেকে খোলা আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত অসংখ্যগুলির আওয়াজ।

দি টাইমস। ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বরঃ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল দস্তখতের জন্য একটা টেবিল বসানো হয়েছে। তখন ডিসেম্বরের শীতের পড়ন্ত রোদ। দূর থেকে অবিরাম গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। আর জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করছে। একটু পরেই গম্ভীর ও কালো মুখে লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিল দস্তখত করলেন। ভারতীয় সৈন্যরা প্রায় পুরো ময়দানটাই 'কর্ডন' করে বাঙালি জনতাকে তখন অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে। জেনারেল নিয়াজীকে যখন ফেরত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তাঁর চোখে পানি আর বাঙালি জনতা চারদিকে থেকে চিৎকার করছে।.....

ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম মেজর জেনারেল নাগরা ঢাকায় প্রবেশ করেছেন অথচ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগরা ঢাকার উপকণ্ঠে যুদ্ধ করেছেন। এ সময় তাঁর কাছে ঢাকাস্থ পাকিস্তানী মিলিটারী হেড কোয়ার্টার থেকে বার্তা এলো যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণে সম্মত রয়েছে। বেলা দশটায় জেনারেল নাগরা এসে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় দ্বিতীয় প্যারাস্যুট রেজিমেন্টের কর্ণেল পান্নু বললেন, 'জেনারেল নিয়াজী বাহ্যিক মনোবল দেখিয়েছেন। তাই আমরা সৈন্য হিসেবে সৈন্যের ভাষাতেই কথাবার্তা বলেছি। এমন কি সামরিক বাহিনীর মধ্যে চালু রসিকতাও হয়েছে।'

লেঃ কর্ণেল রিক্‌খে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের বললেন, 'প্রথা অনুযায়ী অরোরা এসে নিয়াজীর কাঁধ ও বুক থেকে পদবী নির্দেশক চিহ্নগুলো সরিয়ে নিলেন। অস্ত্র জমা দেয়ার পর এটাই হচ্ছে সামরিক প্রথা।'

ঢাকা, ১৭ই ডিসেম্বর ঃ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাঘ্র হিসাবে লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী গতকাল (১৬ ডিসেম্বর) অস্ত্র সংবরণ করেছেন। যে সামরিক নেতা এক সময় সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর জওয়ানরা "শেষ পর্যন্ত লড়াই" করবে, তিনি ৮০,০০০ আটকেপড়া সৈন্যসহ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তা লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে জেনারেল নিয়াজীর এই আনুষ্ঠানিক পরাজয়ের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ২৪ বছরব্যাপী পাকিস্তানী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে রক্ষিত টেবিলে বসে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখতের সময় "টাইগার" নিয়াজীকে খুবই বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর যখন তাঁকে 'হাউস-এ্যারেস্টের' জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন তাঁর চোখ দুটো ছিলো অশ্রুসজল।

আত্মসমর্পণের মাত্র মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে হর্ষোৎফুল্ল পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, "ঢাকা নগরী এখন একটা স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী"।

সৈয়দ হক বললেন, 'আমারও আজ কিছু ভালো লাগছে না। খাওয়াতো হয়নি, চলুন নিচে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক।'

ক্যান্টিনে যাবো,একজন এসে পাকড়াও করলেন সৈয়দ হককে।

'আরে, কোথায় যাচ্ছেন? ক্যান্টিনে? তার আগে চলুন, কিছু পান করা যাক। বিয়ার টিয়ার খেয়ে তারপর একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাবে।'

আহমেদ সাহেব নাছোড়বান্দা। টেনে নিয়ে গেলেন ক্লাবে। অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি, একা তিনি সুরাপান কখনোই করতে পারেন না। তাঁর মাইনের তিন ভাগের এক ভাগ, কম করে হলেও, গেলাসের তরলে বয়ে যায়।

'কি খাবেন?'

আহমেদ সাহেব থাকলে প্রথম কিনবেন আহমেদ সাহেব, এই হচ্ছে নিয়ম। এখানে আপত্তি করা বৃথা।

'আপনারা বসুন গিয়ে, আমি আসছি। আপনার হুইস্কি, আপনার শেরি।'

'দুপুর বেলায় কি করে যে শেরি খান, আপনিই জানেন।'

সারা ক্লাবঘর ভরে গিয়েছে দুপুরের ভিড়ে। বিবিসি'র এই বহির্দেশীয় বিভাগকে ছোটখাটো এক জাতিসংঘ বললে ভুল হবে না। পৃথিবীর কতো জাতের কতো দেশের কতো রকম মানুষ। সাদা, কালো, বাদামী, পীত। ক্লাবঘর উচ্চহাস্যে, কলকণ্ঠে গমগম করছে। কোনো হত্যা, কোনো যুদ্ধ, কোনো সংকটের ভাঁটা পড়ে না এখানকার এই জোয়ারে।

আজ কয়েক বছর যাতায়াত করছি এই বিবিসি'র বুশ হাউসে। বুশ হাউস নামটা কে রেখেছিলো জানি না। বুশ হাউসের বাংলা হয় জঙ্গল বাড়ি। জঙ্গল বাড়িই বটে। ঊনচল্লিশটি ভাষায় বেতার সম্প্রচার হয় এই বাড়ি থেকে। পৃথিবীর এতোগুলো ভাষার মানুষ এখানে। এসেছে তারা কতো দেশ থেকে। সেই সব দেশে কতো দুর্যোগ, কতো অভ্যুত্থান, কতো সংকট, কতো যুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধ। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। মানব অধিকারের জন্য আন্দোলন। কতো হত্যা। কতো মৃত্যু। কতো অপমান, অবমান। কতো বীরত্ব। কতো শৃংখল।

এখানে যাঁরা বেতারে কণ্ঠ দেন, বেতারে খবর পড়েন, অনুষ্ঠান করেন, অনেকেই তাঁরা নিজ নিজ দেশ থেকে কেউ বিতাড়িত, কেউ পলাতক, কেউবা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত।

প্রথম যখন তাঁরা আসেন, তাঁদের দেখে মনে হয়, তাঁরা নিজের দেশের যুদ্ধের জন্যে আন্দোলনের জন্য, সংগ্রামের জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন। মনে হয়, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক সুন্দর ও মানবিক হয়ে উঠলেই দেশে ফিরে যাবেন।

কিন্তু লক্ষ্য করেছি, কেউ তাঁরা ফিরে যান না। ফিরে তো যানই না, বরং এই দেশ এই বিলেতে এই লণ্ডনেই তাঁরা জীবনের সব সুখ সব স্বর্গ দেখতে থাকেন। নারীতে অভ্যস্ত হন, সুরায় ডুবে যান, বিশুদ্ধ মাখন আর রুটিতে স্ফীতোদর হন।

কোনো কিছুতেই আর যেন কিছু এসে যায় না তাঁদের। এই দেহ, এই মাংস, এই মাৎসর্যই হয়ে ওঠে তাঁদের চরম ও পরম।

আমিও কি হয়ে যাচ্ছি তাই?

রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি। বাংলাদেশ থেকে লণ্ডনে চলে এসেছি পড়শোনার নাম করে। পড়াশোনা তো হচ্ছে ছাই।

আমিও করে চলেছি সুরা পান। ভুলে যাচ্ছি বকুলকে। বকুল থেকে দূরে তো সরেই গেছি। এখন রোজ একবার নিকিকে না পেলে শরীরের ভেতরে দুর্ভিক্ষের হয় হাহাকার।

মরিশাসের ভারতীয় বংশের মেয়ে নিকি। কোনোদিন বুঝি কোনো এক পূর্বপুরুষ ছিলো কোনো শ্বেতাঙ্গ এক নাবিক কি প্ল্যান্টেশন মালিক। নিকির বর্ণ শ্যামল লালচে। চোখ ঝকঝকে নীল। কবিতা লেখে ইংরেজিতে।

সেই নিকির সঙ্গে কবিতার সূত্রে প্রথম পরিচয়। অচিরেই কবিতা গেলো কোথায় তলিয়ে। এখনও কবিতার কথা বলি বটে তার সঙ্গে, সে কেবল কাছে থাকার, কাছে যাবার ছল। নিকিকে শয্যায় নেবার জন্য এখন আমি ব্যবহার করছি আমার কবিতার যতো প্রতিভা।

আমি আর সৈয়দ হক ক্লাবের মাঝখানে বিশাল অ্যাকুরিয়ামের পাশে বসলাম। জলজ গাছের ভেতরে ছোট বড় লাল কালো হলদে ধুসর মাছ খেলা করছে, ঘাই মারছে, এ ওর পিঠ ঘষছে, বুদবুদ উঠছে।

আহমেদ সাহেব সুরা এনে সম্মুখে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি একটার বেশি বিয়ার খাবো না।'

'কেন?'

'জানেন, ১৯৭১ সালে পঁচিশে মার্চের খবর যেদিন পেলাম, আপনারা কেউ তখনো এদেশে আসেননি, আমি দুপুরে দু'টোর বেশি বিয়ার খাই না, সেদিন ছ'পাঁইট বিয়ার খেয়েছিলাম। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছিলো। কোনো পাকিস্তানীকে সামনে পেলে হয়তো শেষই করে ফেলতাম। ছ'পাঁইট খেয়েছিলাম।'

আহমেদ সাহেবের পয়সায় সুরা পান করছি, তাই মন্তব্য করাটা ভদ্রতা নয়। বিয়ারের পরিমাণ দিয়ে তার দুঃখের মাত্রা উপলব্ধি করার চেষ্টা অন্তত নকল চেষ্টা করা, সুবিবেচকের কাজ।

দ্বিতীয় দফা সুরা নিয়ে এলেন সৈয়দ হক।

এই স্বাধীনতাটুকু আমাদের নেই কেন? যাকে যা বলা উচিত তা আমরা বলতে পারি না কেন? কোন সাংসারিক বুদ্ধি আমাদের জামার খুঁট টেনে ধরে রাখে, আর বলে যে, ওরে ও কথা বলিস না?

একটাই তো জীবন। একবার মরে গেলে আর কোনদিন ফিরে আসবো না এই পৃথিবীতে। তবু যা আমাদের ইচ্ছে করে তা আমরা করি না; আমরা ভয় পাই, আমরা লুকিয়ে রাখি, আমরা কখনোই কোনো নৌকো দোলাই না পাছে তা ডুবে যায়। কিন্তু কিসের জন্যে? তাতে আমার এই জীবনটার কোন উপকার

হচ্ছে? যে জীবন আর কারো নয়, একান্ত আমারই এবং যে আমি একবার চলে গেলে আর কখনোই ফিরবো না।'

ইচ্ছে হচ্ছিলো, উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি, 'আহমেদ সাহেব, থাকুন আপনার বিয়ার নিয়ে। বাংলাদেশের দুঃখে ক'পাঁইট বিয়ার আপনি খেয়েছেন তাতে বাংলাদেশের কিছু আসে যায় না। বরং নিজেকে আপনি করুণ এক ক্লাউন প্রমাণ করেছেন। আর সেই জন্যে আপনার পাশে বসতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

আহমেদ সাহেব ততোক্ষণে সৈয়দ হকের কানে অবিরাম শুনিয়ে চলেছেন, একাত্তরের মাসগুলোতে বাংলাদেশের জন্যে তিনি কিই না করেছেন। সৈয়দ হক পারেন স্মিতমুখে এই বর্ণনা শুনতে, আমি পারি না। পারলে আমি বিয়ারের পাত্রটা আহমেদ সাহেবের মাথায় ছুঁড়ে মারতাম। কিন্তু না, আমি সভ্য, পরিশীলিত, সামাজিক এবং যে কোন সংকটের সম্ভাবনায় ভীত।

নইলে কেন বকুলকে লিখতে পারছি না এখনো যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

আমি চাই পালাতে। নিজের কাছ থেকে পালাতে।

নইলে, কবেই তো আমি নিকিকে বলতে পারতাম, 'নিকি, তোমাকে চাই। তোমাকেই চাই আমার ভালোবাসার ভেতরে।' কিন্তু তাকে কেন বারবার খুঁজি এই দেহের ভেতরে? ভালোবাসা কি? দেহ না হৃদয়? মাংস না মন? ভালোবাসা ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে না? ভালোবাসা মানুষের মুখের কোন সংস্কার করে যে তখন তার নিজেকেই নিজের কাছে প্রিয় বলে মনে হয়? আর দেহ আনে কোন অপঘাত, মানুষ আঙুল তুলে বলে, 'ওই লুচ্চা যায়।'

আহমেদ সাহেব আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে আচমকা জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বন্ধুদের কি রিয়াকশন?'

ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রশ্নটা। তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে শূন্য চোখে। দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাশট্রের গর্তে ছুঁড়ে ফেলে আহমেদ সাহেব বললেন, 'ভারতীয়দের সঙ্গে আপনার তো এত ওঠাবসা, তারা কি বলছে?'

আমার বলা উচিত ছিল, কেবল ভারতীয়দের সঙ্গেই আমার ওঠাবসা নয়, লণ্ডনে বহু দেশের বহু নাগরিকের সঙ্গেই আমার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব। ভারতীয়দের বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি যদি আমাকে মুসলমানের অনুচিত কর্মে উৎসাহী বলে ইংগিত দেবার চেষ্টা করে থাকেন তো, তাঁকে আমার বলা দরকার ছিল, মানুষকে যে প্রথমত মানুষ হিসেবে দেখতে শেখেনি, সে নিজেই মানুষের ঔরসে জন্ম নিয়েছে কি-না আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু এর কোনোটাই আমি বলতে পারলাম না। আমি বললাম, যদিও একটু আগেই মৌনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে, 'আজ ওদের কারো সঙ্গে কথা হয়নি। দেখা হয়নি।'

আমার ভেতরে আমরাই আত্মার একাংশ আমাকে নির্মম হাতে চাবুক মারতে লাগল। কেন আমি পারি না, আমার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে? কে আমাকে পেছন টেনে ধরে রাখে? আর কতকাল আমি এভাবে নিজের থেকেই মুখ ফিরিয়ে থাকব?

সৈয়দ হক বললেন, 'আহমেদ সাহেব, ভারতীয়দের বলতে আপনি যদি ভারত সরকারের রিয়াকশনের কথা বলে থাকেন তো, মাহতাব সাহেব, আপনি, আমি বা কারোর পক্ষেই তা জানা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কি বলেন, মাহতাব?'

উত্তরে ম্লান হাসলাম আমি। মৌনার কথা মনে পড়তে লাগল। ওকে আমার কখনোই বিশেষ করে ভারতীয় মনে হয়নি, যেমন আমার নিজেকেও কখনোই বিশেষ করে বাংলাদেশের মনে হয়নি।

আহমেদ সাহেব বললেন, 'আমার তো মনে হয়, ভারত চুপ করে বসে থাকবে না, বাংলাদেশকে হাতছাড়া হতে দেবে না। দেখবেন হয়ত সৈন্য পাঠাবে। হয়ত, এতক্ষণে একটা কিছু হয়েও গেছে।'

সৈয়দ হক আপত্তি করলেন।

'ভারত তা করবে না বলেই মনে হয়। তবে, সতর্ক হয়ে দেখবে, বাংলাদেশের ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। ভুলে যাবেন না, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারতীয়রা তা বলে না।' আহমেদ সাহেব ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এইতো সেদিন মিসেস মুখার্জী, এক পার্টিতে দেখা, নিজ কানে শোনলাম, বলছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিল্লীর পায়ের তলায়। বলুন? আপনিই বলুন?'

আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশ যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহিয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী-যিনি কেবল মানুষের নয় মানবতারও নেতা, তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আহমেদ সাহেবের চ্যালেঞ্জ নিতে সৈয়দ হককে বিশেষ উৎসাহী মনে হলো না। কিন্তু আমি এবারে কিছু না বলে থাকতে পারলাম না।

বললাম, 'আপনার মিসেস মুখার্জীকে আমি জানি না, তবে তিনি যা বলেছেন তা ভারত সরকার কিংবা সব ভারতীয়েরই কথা, এ আমি ধরে নিতে পারছি না।'

'আপনার তা পারবার কথাও নয়।' অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় আহমেদ সাহেব বললেন এবং আরো বললেন, 'আপনার বাস তো ভারতীয়দের স্বর্গে।' বলে তিনি দুম দুম করে উঠে চলে গেলেনে।

সৈয়দ হক বললেন, আমার হাতের ওপর হাত রেখে, 'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, মাহতাব। উনি ঐ রকমই বলে থাকেন।'

'অর্থাৎ ওঁর কথায় কিছু মনে করলে আমার এখানে আসার অসুবিধে হতে পারে এই তো?'

'আমি তা বলিনি।'

'না বললেও আমি জানি।'

'উত্তেজিত হবেন না।'

'সময়মতো উত্তেজিত হতে পারি না বলেই এখন উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। আর কি বলব? আর কি বলার আছে? পাকিস্তানীদের হাতেই যদি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হয়ে থাকে তো সেটা কি খুব ভালো হবে? ভারতীয়রা এখন এতই খারাপ? মনে নেই সৈয়দ হক সাহেব, একাত্তরে আপনি তো তখন ঢাকায়, মনে নেই, ঢাকার লোকেরা, সারা বাংলাদেশের লোকেরা, আল্লার কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করেছে। আসুক ভারত, এসে এই পশুগুলোকে খতম করে যাক। বাংলাদেশের লোকেরা ভারতীয় সৈন্যদের গলায় পরিয়ে দেয়নি ফুলের মালা? আনন্দে তাদের মাথায় করে নাচেনি? বলুন হক সাহেব, এখন আমাকে শুনতে হচ্ছে আমি বাস করি ভারতীয়দের স্বর্গে?'

'যাক, ওসব থাক। আজ কারোর মাথা ঠিক নেই। বঙ্গবন্ধুর এভাবে মৃত্যু হবে কে ভেবেছিল, বলুন? এখন আমাদের অনেক কিছু ভেবে দেখার দরকার আছে, মাহতাব। চলুন, এখান থেকে বেরোই। কিছু খেয়ে নি। আপনিও তো খাননি।'

সৈয়দ হকের সঙ্গে ক্যানটিনে গিয়ে বসলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কিছু নামতে চাইল না। গলার ভেতরে, পেটের ভেতরে, শক্ত মুঠোর মতো দলা পাকিয়ে আছে নিষ্ফলা একটা আক্রোশ আর দীর্ঘ এবং তলহীন এক শূন্যতা। চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

কেন? কার জন্যে?

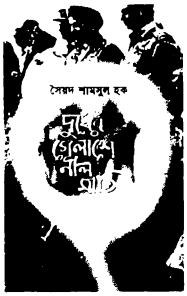

৬

এরপর বসতে মোটেই মন চাইছিল না, তবু ওপরে গেলাম; দেশ থেকে নতুন কোনো খবর যদি এসে থাকে। না, নতুন কোনো খবর নেই। আহমেদ সাহেবের শংকাও এখনো সত্যি হয়নি; ভারত সৈন্য পাঠায়নি।

সারা ঘরে কেউ নেই। সবাই ষ্টুডিওতে গেছে। আমি একা পা ছড়িয়ে বসে আছি। মনিটর সেটে শুনছি আজ বিকেলের বাংলা অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠান এখন বাংলাদেশে সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। প্রায়ই তো এমন হয়, বাংলাদেশে কেন, খোদ ঢাকায় থেকেও ঢাকার খবর পাওয়া যায় না, বিবিসির কাছে শুনতে হয়। একাত্তর সালে সবক'টা বড় খবর পেয়েছি বিবিসি থেকেই। আজো নিশ্চয়ই দেশের লোক রেডিও সেট ঘিরে আছে শেখ মুজিব হত্যার বিশদ বিবরণ পাবার জন্যে।

বকুলও নিশ্চয়ই শুনছে। হয়ত ভাবছে আমার গলা শুনতে পারবে।

বিশ্ব সংবাদ শেষ হলো। এখন শুরু হলো রাজনৈতিক ভাষ্য, বিশ্লেষণ, সংবাদদাতার বিবরণ। প্রথমেই শেখ মুজিব সম্পর্কে কথিকা। চমকে উঠলাম গলা শুনে। শেখ মুজিবের গলা। জাতিসংঘের বাংলাদেশ সদস্যপদ পাবার পর সাধারণ পরিষদে দেয়া শেখ মুজিবের ভাষণ। সে ভাষণ বাংলায়। জাতিসংঘের দরবারে এই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল বাংলা। বাংলায় তাঁর সে ভাষণের অংশবিশেষ শুনে সেদিনের মতো আজো মনটা হঠাৎ সতেজ এবং উদ্যমী হয়ে উঠলো। ভেতরকার এতক্ষণের গ্লানি আর ক্রোধ আর শূন্যতার খানিক উপশম হলো।

মনে হলো, কোথাও আমার বেরুনো দরকার। মনে হলো, আমার হাতে কত কাজ পড়ে আছে, সেগুলো করে ফেলা দরকার, এক্ষুণি সব শুরু করা দরকার।মনে হলো, আমার সমস্ত কিছু আমারই কাছে আছে। যেন আমি লণ্ডনের টিউব রেলে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে, হঠাৎ পেরিয়ে এলাম দিনের আলোয় এবং মানুষের উষ্ণতার ভেতরে, আকাশের নীল এবং গাছের সবুজের মণ্ডলে।

নিজেরই অজান্তে ঘর ছেড়ে করিডোরে কখন বেরিয়ে এসেছি; সুফি সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই এখানকার এই বাস্তবতা চারদিক থেকে আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লিফটের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। লাহোরের লোক, এখানে উর্দু অনুষ্ঠানে করেন। সুফি সাহেব লাহোরের মানুষ হলেও, ভালো বাংলা বলেন। আমাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতে পছন্দ করেন তিনি। হয়তো, মনের মধ্যে এখনো তিনি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ বলেই মনে করেন। বললেন, 'বড় দুঃখিত হলাম শেখের খবর শুনে। তবে আপনি বলতে পারবেন একটা খবর, জানি না সত্যি কি না।'

'কি খবর?'

'আজ নাকি শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার কথা ছিল?'

'শুনিনি। কি হয়েছে তাতে?'

'শুনলাম, সেখানে ইণ্ডিয়ান কয়েকজন জেনারেলেরও আসবার কথা ছিল।'

'কেন, তারা আসবে কেন?'

'তা জানি না। হয়ত, অতিথি হিসেবে। আর সেখানেই নাকি শেখ মুজিবের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল যে, বাংলাদেশের ডিফেন্স আর ফরেন অ্যাফেয়ার্স তুলে দেয়া হলো ভারতের হাতে। শুনেছেন?'

'না, শুনিনি। কোথায় শুনলেন?'

'লোকেরা বলাবলি করছে।'

সুফি সাহেব সত্যি সত্যি কথাটা বিশ্বাস করছেন, কিংবা আমাকে পরীক্ষা করে দেখছেন, বুঝতে পারলাম না। কেনো মন্তব্য করাটারও কর্তব্য মনে করলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে লিফটের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সুফি সাহেব কথা বলেন অতি শান্ত স্বরে, নীচু পর্দায়। তাঁর খুব কাছে না দাঁড়ালে ভালো করে বোঝাই যায় না কি বলছেন। আর মুখে সারাক্ষণ এমন একটা অভিব্যক্তি, যেন এই মুহূর্তে বিশ্ব তাঁকে অন্যায়ভাবে সর্বস্বান্ত করে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, সুফি সাহেব তসবি গুনছেন। দিনে পাঁচবার নিয়মিত নামাজ পড়েন ভদ্রলোক। আমার দিকে চোখ পড়তেই বিড় বিড় করে বললেন, 'ভারত থেকেই এখন আপনাদের সাবধান থাকা দরকার। দেখুন কি হয়। রাজীনিতি বড় খারাপ জিনিষ।'

টুং করে ঘন্টা বাজলো। জ্বলে উঠল অধোমুখী লাল তীর। নীচে যাবার লিফট এসে গেছে। কিন্তু এতক্ষণ যা মাথায় আসেনি, এখন এলো- আমি যাচ্ছি কোথায়?

এই মুহূর্তে কোথাও তো যাবার নেই।

লিফট ধরে সুফি সাহেব ডাকলেন, 'নীচে যাচ্ছেন না?'

'না।'

লিফটের দরোজা তাঁকে গ্রাস করে বন্ধ হয়ে গেল। লাল তীর নিভে গেল। নির্জন হয়ে গেল করিডোর। আমি অফিসে ফিরে গিয়ে নিকিকে ফোন করলাম।

'নিকি, কখন ফিরিলে?'

'এইতো, আধঘন্টা।'

'প্রকাশক কি বলিল?'

'বই সে প্রকাশ করিবে। তবে বইয়ের শিরোনাম বদল করিতে হইবে। তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।'

'বলো, কি কাজ?'

'আমার ছবি তুলিয়া দিতে হইবে বইয়ের জন্য।'

'আমি? আমি কি ভালো ছবি তুলি?'

মুখে সন্দেহ জানালেও মনে মনে চকিত খুশির ঢেউ একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। মাথার ভেতরে তৎক্ষণাৎ দেখতে পেলাম ক্যামেরায় নিকিকে ধরবো কোন ভঙ্গিতে। পেছন ফিরে চুলের ওপার থেকে যখন তাকায়, অপরূপ লাগে নিকিকে।

'যা হউক, তোমার তোলা ছবিই বইতে যাইবে। ছবির জন্য প্রকাশক পঁচিশ পাউণ্ড বরাদ্দ রাখিয়াছে। টাকাটা তোমার কাজে লাগিবে।'

তাহলে আমাকে সাহায্য কররবার জন্যে। নিকি চায় আমি তার ছবি তুলি?

'এখন আসিবে?' নিকি জানতে চাইলো।

'না। পারিতেছি না। এখন অনেক কাজ। জানো তো, শেখ মুজিব মারা গিয়াছে। অফিসে আমাকে কাজ করিতে হইবে। কাজ করিলেই টাকা। টাকার অতীব প্রয়োজন আমার।'

একটানা গড়গড় করে মিথ্যে বলে গেলাম, কেবল ঐ টাকার দরকারটুকু ছাড়া। টাকা সত্যি আমার চাই। বিবিসিতে মাঝে মাঝে কাজ করে যা পাই, তাতে বাসাভাড়া, সিগারেট আর যাতায়াত চলে যায় টেনেটুনে। মাঝে মাঝেই রেস্তোরাঁয় কাজ করতে হয়। তাই বলে নিকি আমাকে টাকার সাহায্য করতে চাইবে?

অন্তর্যামীর মতো নিকি বলল, 'কোনো কারণে তুমি কিছু মনে করিয়াছো।'

চমকে উঠলাম তার অনুমানের টিপ্ লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছু বললাম না।

'আমি জানি পঁচিশ পাউণ্ড তোমাকে পাইয়া দিবার কথা বলিয়াছি, ওটা পছন্দ করো নাই। ঠিক নহে?'

'তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনিতেছি।'

'কবে তোমার বাল্যকাল যাইবে, মাহতাব?'

'যাক না যাক, আমার কোনো পরোয়া নাই।'

'একটা কথা বলিলে কিছু মনে করিবে না তো?'

'বলো।'

'তোমরা, এই পূর্ব দেশের মানুষেরা, মিথ্যা কিছু পৌরুষত্ব লইয়া পড়িয়া আছো।'

'তাহার অর্থ?'

'আমি নারী হইয়া তোমাকে টাকার জোগাড় করিয়া দিতে চাহিয়াছি, ইহাতে তোমার অন্ত্রে ঘা লাগিয়াছে।'

'এক বিন্দু সত্য নহে।'

'তুমি মিথ্যা বলিতেছ, মাহতাব। নিজেকেই প্রশ্ন করিয়া দ্যাখো। আমাকে তুমি বন্ধু হিসেবে লইতে পারো নাই। আমাকে তুমি একটি মেয়ে ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারো না। অথচ, আমি সর্বদা চাহিয়াছি, তুমি পূর্ব দেশের আর দশটা মানুষের মতো হইবে না।'

'পূর্বের মানুষ কি তুমি দেখিয়াছ?'

'তোমাকে তো বলিয়াছি, বলি নাই? আমি প্রথম যাহাকে ভালোবাসিয়া ছিলাম, যাহার সহিত দেড়বৎসর ছিলাম, সে পূর্ব দেশের।'

'হাঁ, ভিয়েতনামের। শুনিয়াছি তোমার নিকটে।'

'আর তাহাকেও আমি মনে করিতাম পূর্বদেশের আর দশটা মানুষের মতো নহে। শেষে দেখিলাম, রক্তের রঙ বদলায় না'

'না, বদলায় না।'

আমার নিজের গলা নিজের কাছেই নির্মম শোনালো। মনে হলো, আমি এখন আমার প্রিয় সমস্ত কিছুকে কেটে ফেলতে পারি, ছুঁড়ে ফেলতে পারি, উড়িয়ে দিতে পারি। আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।

নিকি বলল, 'এখন আমি ঘরেই আছি, আসিবে? কবিতা শোনাইবো।'

'না। আমার কাজ আছে।। কাল আসিব।'

'আগামীকল্যের কথা আজ দিয়ো না।'

রাখিয়া দিতেছি।

'আচ্ছা।'

'তোমার নতুন বই প্রকাশিত হইবে, খুশি হইয়াছি'

'ধন্যবাদ।'

'কিছু মনে করিও না। আজ আমার মন ভালো নাই।'

'আচ্ছা'।

'আচ্ছা'।

'রাখিলাম।'

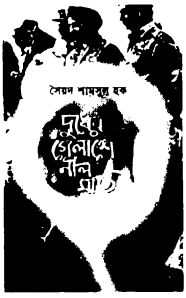

৭

এক মুহূর্তে ফাঁকা এবং অস্পষ্ট মনে হলো সবকিছু। তার পরই চারদিকের আসবাব, দেয়াল, ছবি, জানালা আবার ধারণ করল তাদের তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা এবং যে যার জায়গায় ফিরে গিয়ে স্থির হয়ে রইলো।

এখন আমি কোথায় যাবো? পূর্বদেশের লোকেরা মনে করে আমি আমার জন্মের পালক খসিয়ে পশ্চিমের পালক পরেছি। পশ্চিমের লোকেরা লক্ষ্য করে আমার পোশাকের তলে পূর্বদেশের বাদামী দেহ। বাংলাদেশের লোকেরা বলে বাংলাদেশকে আমি ত্যাগ করেছি। আর ভারতীয়রা মনে করে আমি এখনো যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় নই। বকুল ভাবে, আমার গোরস্তানে যে ফুল ফুটে আছে, সে তার ভালোবাসা।

আহমেদ সাহেব ঘরে ঢুকে বললেন, আপনি এখনো বসে আছেন?'

নেহাৎই তাঁর কৌতুহল, না, আমাকে চলে যেতে বলছেন, বুঝতে পারলাম না। টেবিলে কাগজপত্র নামিয়ে রাখতে রাখতে তিনি বললেন, 'আমি বরাবরই বলে এসেছি, খন্দকার মুশতাক ইজ দ্যা ম্যান টু ওয়াচ। এখন দেখুন। আসলে মিলিটারি-ফিলিটারি কিছু না। খন্দকারই সব। এতদিন সময় নিচ্ছিলেন, দেখছিলেন শোধরায় কিনা; শেষে শেখ যখন সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার পরেও বাংলাদেশকে নিজের জমিদারী বানাতে সব দল ভেংগে দিয়ে একটা তাঁবেদার দল করলেন, তখন খন্দকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।'

বললাম, 'কিন্তু খন্দকারকে তো কখনো কোনো প্রতিবাদ করতে শুনিনি। সংসদে বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই প্রতিবার হাত তুলেছেন, প্রতি কাগজে তাঁর দস্তখত দেখেছি প্রথম কয়েকটা নামের মধ্যেই।'

'ওটাই তো রাজনীতির কৌশল, মাহতাব সাহেব। বাংলাদেশ ডুবে যেতে যেতে বেঁচে গেল, এটা জেনে রাখবেন।

নইলে আজ বাংলাদেশ সিকিম হয়ে যেত।'

আহমেদ সাহেব চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর পা লম্বা করে দিয়ে, উদার হাতে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন।

'না, এখন আর খাবো না। চলি।'

'চললেন?'

'হ্যাঁ, নীচে যাই।'

'নীচে, ক্যান্টিনে মিটিংয়ে যাচ্ছেন বুঝি?'

ভুলেই গিয়েছিলাম, আলমগীর বলেছিল ক্যানটিনে বিকেলে কয়েকজন আসবে।

'হ্যাঁ, দেখি।'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আহমেদ সাহেব বললেন, 'বাইরের লোক এসে বিবিসি'র ক্যানটিনে মিটিং করাটা কি ভালো? একটু বলে দেবেন।'

'আমিও বাইরের লোক। দরকার হলে আপনিই বলবেন।'

'শুনুন।'

বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, আহমেদ সাহেবের ডাকে থামতে হলো।

'শুনুন, সন্ধ্যেবেলায় যদি থাকেন তো ক্লাবে আসবেন? বিয়ার খাওয়াতে পারি।'

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মিটিংয়ে কি কথা হয়, আমার কাছ থেকে জানবার জন্যেই তাঁর এ নিমন্ত্রণ করা। সত্যি সত্যি হাসি পেল। হেসেই ফেললাম।

আহমেদ সাহেবও হেসে বললেন, 'তাহালে আসছেন তো ক্লাবে?'

'বোধহয় পারছি না।'

তাঁর মুখে নতুন অভিব্যক্তিটা দেখার জন্যে লোভ হলো, কিন্তু দাঁড়ালাম না। সোজা নেমে এলাম নিচে, ক্যান্টিনে, লিফটের জন্যে অপেক্ষা না করে, সিঁড়ি ভেঙ্গে।

এস দেখি, কোণের লম্বা টেবিলের মাথায় একা আলমগীর গম্ভীর মুখে বসে আছে। সকালের তুলনায় এখন তাকে রীতিমত মেঘাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে এবং সেই পরিমাণে স্বল্পভাষী।

ইঙ্গিতে আমাকে সে বসতে বললো। সংক্ষেপ নিমন্ত্রণ জানালো, 'চা?'

'আমি আনছি। আপনার জন্যেও তো?'

হাত দিয়ে নিষেধ করলো আলমগীর। হয়তো আসন্ন মিটিংয়ের উপযোগী একটা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যে তার এ স্বল্পভাষিতার সাধনা।

চা নিয়ে এসে বসলাম।

'কখন আসবে ওরা?'

'সাড়ে চারটেয়।'

'অফিসের পরে আসবে।'

অর্থাৎ ছ'টা সাড়ে ছ'টা হয়ে যাবে। মৌনাদের বাড়িতে সাতটায় যাবো বলেছি, সেখানে যেতে কম করেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মিটিংয়ে পুরো থাকতে পারবো না বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য, থাকবার খুব একটা তাগিদও নেই। কেবল এইটুকু কৌতুহল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকে কেন্দ্র করে নতুন কি গুজব ছড়িয়েছে লণ্ডনে।

নীরবে চা শেষ করে বললাম, 'আলমগীর, আমি হয়তো পুরো সময় থাকতে পারবো না। একটা কাজ আছে।'

আজো কাজ? আমরা সকলেই যদি দায়িত্ব এড়িয়ে চলি, মাহতাব সাহেব, তাহলে বাংলাদেশের ভাগ্যে যা ঘটছে, তার চেয়ে ভিন্ন কিছু আশা করা যায় না।'

দপ্ করে আগুন ধরে গেলো আমার মেজাজে।

'এ মিটিংয়ে হাজির থাকাটা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের একমাত্র প্রমাণ বলে কেন মনে করছেন, আলমগীর?'

তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত চোখে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার চোখের দিকে। তারপর সমস্ত মুখ শিথিল এবং সহাস্য করে তুললো সে।

বললো, 'আমরা কাউকে জোর করছি না। আপনার কাজ আছে, বেশ তো, আপনি চলে যাবেন।'

আলমগীরের কথার ধরণটা আমার একেবারেই পছন্দ হলো না। এভাবে কথা বলার অধিকার, ওপরতলা থেকে প্রশ্রয়ের সুরে অনুমতি দেবার ধৃষ্টতা, এদের হয় কোত্থেকে?

আজ যদি প্রত্যেকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগারই দিন হয়, তো তাই হোক

বললাম, 'আপনি বলেছিলেন বলেই খানিকটা সময় করে এসেছি। তবে এসেছি, যখন এভাবেও চলে যাবো না। যাবার আগে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, লণ্ডনে বসে আপনারাই বা দেশের কি এমন দায়িত্ব পালন করছেন?'

'উত্তরটা কি দিতেই হবে?'

এখনো সে প্রশ্রয়ের সুরে কথা বলছে। আমার, তীব্র ইচ্ছে করে উঠলো মুখোশটা একটানে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলে দিই ওর।

জোর করে শান্ত গলায় বললাম, 'উত্তর না দিলে ধরে নেবো, দেবার মতো কোনো উত্তরই আপনার কাছে নেই।'

অনেকক্ষণ ভেবে আলমগীর বললো, 'সব কথা বলতে পারছি না। তবে এটুকু জেনে রাখুন, আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি, যেন দেশের ডাক আসা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।'

'তাই নাকি?' আমার গলায় বিদ্রুপটুকু লুকোবার কোনো চেষ্টা করলাম না।

'ভবিষ্যতেই দেখতে পাবেন।'

'কতোদিন আছেন লণ্ডনে?'

এ প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলো না আলমগীর। হকচকিতে বললো, 'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি। কতোদিন আছেন লণ্ডনে?

'তা বছর আটেক হয়ে গেলো।'

'আর এই আট বছরে নিজের বাপ মায়ের প্রতি সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেননি, অর্থাৎ পরীক্ষায় পাস করার মতো সামান্য কাজটা করতে পারেননি।'

'আপনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন।'

'না। আপনি ব্যতিক্রম নন, দশজনের ভেতরে একটি উদাহরণ।'

'তাছাড়া, কে বললো আপনাকে যে আমি পরীক্ষায় পাস করে ব্যারিস্টার হতে চাই আর সেটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্যে?'

এতোক্ষণে আলমগীর তার কৃত্রিম হাসিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলো। টেবিলে চাপড় দিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, 'কে বললো আপনাকে? আর আমিই বা আপনাকে কৈফিয়ৎ দেবো কেন?'

'কি হয়েছে, আলম?'

একেবারে ঘাড়ের ওপর মেয়ের গলা শুনে চকিত হয়ে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি এক শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী।

মুহূর্তে আলমগীর সামাজিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে বললো, 'এসো অ্যান, এসো। অ্যান, ইনি মাহতাব, আমাদের বিশেষ বন্ধু।'

জোর করে আমার মুখটাতে স্মিথ এবং স্বাভাবিক করতে গিয়ে মুখের সমস্ত পেশীতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলাম।

অ্যান গিয়ে আলমগীরের পাশে বসলো। জানতে চাইলো, ঝগড়াটা কিসের?

উত্তর দিলো আলমগীরই। 'ঝগড়া নহে, রাজনীতি। চা না কফি?'

'কফি।'

আলমগীর উঠে গেলে অ্যান আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। সে হাসি আলাপ শুরু করার জন্যে অনুরোধ মাত্র।

আমাকে তবু নীরব দেখে অ্যান নিজেই বললো, 'দীর্ঘদিন আলমকে তো দেখিতেছি, কিছুতেই গলা নামাইয়া কথা কহিতে পারে না। শুনিয়াছি, তোমাদের সকলেই চেঁচাইয়া কথা কহে। আমি আলমকে বলিয়াছি, ও রকম হৈ চৈয়ের ভিতরে আমি একদণ্ড টিকিতে পারিবো না।'

জানতে ইচ্ছে হলো, আলমের মতামতটা কি।

'আলম? হৈ হৈ তাহারও পছন্দ নহে, যদিও নিজে সারাক্ষণ চিৎকার করে। উহা বোধহয় রক্তের ব্যাপার। তুমিও চিৎকার করিয়া কথা কও নাকি?'

উত্তরে নি:শব্দে একটু হাসলাম এবং আলমগীর কফি নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

'চলি তাহলে।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

বেরুবার মুখে দেখলাম জনা তিনেক বাঙালী, লণ্ডনে যাঁরা রাজনীতি করেন, ধীর পায়ে, চিন্তিত মুখে ক্যান্টিনে ঢুকছেন ভালো করে তাঁদের চিনি না; তবু চোখে চোখ পড়ায় সামান্য হাসতে হলো। একজন নিঃশব্দে ভ্রূ তুললেন, অর্থাৎ আমি কি মিটিংয়ে থাকছি না? আমিও কোনো কথা উচ্চারণ না করে মাথা নাড়লাম এবং বেরিয়ে গেলাম পাশ কাটিয়ে।

সিঁড়ি ভেঙ্গে একতলা দিয়ে বাইরে এসে দেখি, আকাশে ঘন মেঘ। অফিস ভাঙতে শুরু করেছে, অসম্ভব লোকের ভিড়; গাড়ির স্রোত; টইটম্বুর বাস। মৌনাদের বাড়িতে বাসেও যাওয়া যায়, ট্রেনেও। এখন যাত্রা করলে ঘন্টাখানেক আগেই পৌঁছে যাবো। মৌনা অফিস থেকে না ফিরলেও সৌমেন তো থাকবে বাড়িতে। তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়বো?

বরং একটা বইয়ের দোকানে ঢোকা যাক। কিছুটা সময় কাটবে। আর মৌনার সঙ্গে দেখা হবার আগে সারাদিনের বিরক্তিগুলো ঝেড়ে ফেলবারও অবকাশ হবে।

আকাশটা হঠাৎ বিদ্যুতে চিরে গেলো। তারপর একটানা একটা গর্জন এবং অচিরেই বাতাস। লণ্ডনে সচরাচর মেঘের ডাক শোনা যায় না; অন্তত আমি বড় একটা শুনিনি। একেবারে দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, দেশের সেই মেঘ, সেই বর্ষা।

বৃষ্টির একটা ফোঁটা এসে আমার হাতের ওপর পড়লো। রাস্তায় জনস্রোতের ওপর এক মুহূর্তে ফুটে উঠলো ছাতার অজস্র ফুল।

১৪ই আগস্ট। ১৯৭৫

বিষ্যুদবার।

দিনের আলো নিভে এল।

রাত এল। কালো রাত।

মার্চ ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধুকে বলা হলঃ সেনাবাহিনীকে বসিয়ে রাখা সঠিক নয়। সেজন্য নির্দেশ গেলঃ টেনিং কোর্স চালু কর। বিশেষতঃ ট্রেনিং প্রয়োজন

পুনর্গঠিত ট্যাংক বাহিনীর ও গোলন্দাজ বাহিনীর অর্থাৎ সেকেণ্ড ফিল্ড আর্টিলারী এবং বেঙ্গল ল্যান্সারের। কিন্তু তাদের নিকট ট্রেনিং বড় কথা ছিল না। তাদের মনে ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

সেজন্য তারা ১৯৭৫ সনের মার্চ মাস থেকেই একত্রে ট্রেনিং শুরু করে। সেই সাথে তারা এ নির্দেশ ও অনুমতি লাভেও সক্ষম হয় যে অন্যান্য ট্রেনিং ব্যতিরিকেও প্রতিমাসে তারা দু'বার নাইট ট্রেনিং করতে পারবে।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগষ্ট।

এমনি এক ট্রিনিং। টেনিং-এ ট্যাংক রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার-এর সাথে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারীর সমন্বয় সাধন করা হয়।

এসব বাহিনীর সর্ব সাকুল্যে সেনাশক্তি ৪০০ জন মাত্র ছিল।

টি-৫৪ ট্যাংক ৩০টি, কামান ১৮টি, এর মধ্যে দুটি ট্যাংক নষ্ট, অকেজো ছিল। কামানের ক্যাটাগরী ছিল ১০৫ এম, এম যুগোশ্লাভের তৈরি হাউটজার।

ষড়যন্ত্র চলছিল অন্যভাবেও।

সেকেণ্ড ফিল্ড আর্টিলারী ব্যাটালিয়ানের কম্যান্ডিং অফিসার তখন লেঃ কর্ণেল আনোয়ার হোসেন।

আর ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার বাহিনীর অর্থাৎ ট্যাংক বাহিনীর কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন লেঃ কর্ণেল আব্দুল মোমেন।

কিন্তু ১৪ আগস্ট রাতে নাইট ট্রেনিং-এ যাবার সময় দেখা গেল লেঃ কর্ণেল আনোয়ার হোসেন পূর্বেই প্রেসিডেন্টের স্পেশাল মিলিটারী সেলের ডেপুটেশনে সেখানে কর্মরত আছেন। আরো দেখা গেল, বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল আব্দুল মোমেন ছুটিতে বাইরে আছেন।

সুতরাং সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারী কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল মেজর রশিদের উপর এবং বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব ন্যস্ত হল মেজর ফারুক রহমানের উপর।

সেনাবাহিনীর কোন্ উর্ধ্বতন অফিসারের ষড়যন্ত্রে এরূপ 'সুবর্ণ দায়িত্ব' মেজর রশিদ-ফারুকের হাতে গিয়ে পড়েছিল আজ তা প্রকাশিত না হলেও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত তা বলে দেবে।

সুতরাং ট্যাংক বাহিনী ও আর্টিলারী রেজিমেন্টের দায়িত্ব পেয়ে দুই ভায়রা পরিকল্পনা মাফিক বর্তমানে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সৈন্য সামন্ত, কামানসহ গমন করে।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাওয়ার পূর্বে তারা সেনাবাহিনী হতে বহিষ্কৃত কতিপয় অফিসারকে শেখ মুজিবের ও তাঁর সরকারের উপর যাদের

ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল তাদের ঐ বিমান বন্দরে আসার জন্য সংবাদ প্রেরণ করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র এক ঘন্টা পূর্বে প্রাক্তন অফিসারবৃন্দ তাদের সাথে যোগ দেয়।

১৫ই আগষ্ট ভোর ৪-৪০ মি: থেকে পাঁচটার মধ্যে উপস্থিত সেনাশক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হল। পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হয়। ১২টি ট্রাকে কালো যমধূতের দল। ট্যাংক গর্জন করে উঠল।

চাঁদ ডুবে গেছে তখন। বিশাখা চলে গেছে।

অনুরাধা এসেছে লক্ষ কোটি তারার মিটিমিটি রহস্য নিয়ে।

স্তিমিত আলো আঁধারের ছায়াছায়া মূর্তিগুলো বিভীষিকার মতো জ্বলছে। জুপিটার আর মার্চ বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান ও প্রথম প্রতিবন্ধকতা রক্ষীবাহিনী। ঢাকায় তখন তিন হাজার রক্ষীবাহিনী মোতায়েন।

ফারুক দায়িত্ব নিল রক্ষীবাহিনীকে নিউট্রালাইজ করার।

ডালিমের দায়িত্ব ছিল, মেজর মহিউদ্দিনও এক কোম্পানী ল্যানসার নিয়ে মেজর নূর ও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়া। সেরনিয়াতকে হত্যা।

আর শাহরিয়ার ও অন্যদের রেডিও দখলের দায়িত্ব।

নায়েক সুবেদার মোসলেমের দায়িত্ব ছিল শেখ মনিকে হত্যার।

ফারুক জানত ঢাকায় তখন তিন হাজার রক্ষীবাহিনী কিন্তু তাদের হাতে ভারী অস্ত্র নেই। সবাই হালকা অস্ত্র। ট্যাংক বিধ্বংসী নেই।

ট্যাংকে কোন প্রকার গোলাবারুদ ছিল না। সেজন্য রশিদের বাহিনীর নিকট হতে পর্যাপ্ত অন্যান্য অস্ত্র, কামান সরবরাহ নেয়া হয়।

রশিদকে বলা হয়েছিল, শেখ মুজিবের বাসার দিকে গোলা নিক্ষেপ করতে যাতে রক্ষী বহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা শেখ মুজিবের সাহায্যে অগ্রসর হতে না পারে।

ফারুক রহমান ২৮টি ট্যাংক নিয়ে সম্ভাব্য প্রতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট গ্যারাজ হতে বের হয়। কিন্তু তেজগাঁও বিমান বন্দরের নিকট এসে সে দেখল তাকে শুধু একটি মাত্র ট্যাংকই অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

ফারুক এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'তাতেও আমি ভড়কে যাইনি। আমার ট্যাংক নিয়ে বিমান বন্দরের সীমান্ত প্রাচীর ভেঙ্গে কয়েকটি গাছকে দুমড়িয়ে আমি যখন রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের নিকটে চলে এলাম তখন দেখলাম তিন হাজার রক্ষীবাহিনীর একটি বিগ্রেড লাইন আপ হয়ে আছে। তারা যুদ্ধাস্ত্রে

সজ্জিত, হেলমেট পরিহিত। এসব দেখে আমার ট্যাংকের ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস করল, তার করণীয় কি? আমি তাকে বললাম যে, ৬´´ ইঞ্চি ব্যারেল তাদের নাক বরাবর উঁচু করে ধর। গানারকে বললামঃ তোমার 'গান'কে তাদের দিকে তাক কর। দেখলাম তারা বেশ সাহসী দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। আমরাও তাই করলাম। আমি ড্রাইভারকে বললাম, যদি তারা আমাদের কিছু করতে চায় তাহলে তুমি ডান দিকে স্টিয়ারিং কেটে সরাসরি চালিয়ে দেবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ঘটল না। রক্ষীবাহিনী পরিস্থিতি বিবেচনা করছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমার স্থির প্রতীতি ছিল যে, তারা আর সহসা কোন প্রকার রিয়াক্ট করবে না।

সি, আই, এ, ও আর্ম ক্যু প্লানারদের একটি মাত্র মাথাব্যথা ছিল আর তা হল রক্ষীবাহিনী। রক্ষীবাহিনীকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কৌশল গ্রহণ করা ছাড়াও তারা রক্ষীবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিফেন্স সম্পর্কিত একটি কোর্সের প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রটনা করা হল, রক্ষীবাহিনীর জন্য ট্যাংক যোগাড় করতে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান বিদেশে যাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ১২ই আগষ্ট রওনা হন। পথে লণ্ডনে জানলেন বঙ্গবন্ধু নিহত। তাঁর আর কিছু করণীয় ছিল না।

সি, আই, এ, রক্ষীবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য মোক্ষম সময়ে রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এটা আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান যে ক্যুদেতা সংগঠকদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তার বড় প্রমাণ ২রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে যখন খুনী মেজরদের হটানো হচ্ছিল তখন তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রক্ষীবাহিনীর চার্জে তখন লেঃ কর্ণেল আবুল হাসান। পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার। ভীত। আতঙ্কগ্রস্ত। পলাতক।

রক্ষীবাহিনীকে অর্ডার দেয়ার কর্তৃত্ব পাওয়া গেল না।

দীপক তালুকদার সিনিয়র লিডার রক্ষীবাহিনীর। সেদিন তিনি ডিউটি অফিসার। অতি প্রত্যুষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ব্যবস্থাদি দেখতে গেলেন। সহসা বিকট কামানের আওয়াজ। মিৎসুবিসি মাঝারি ট্রাকে তার সাথে এক সেকশন রক্ষী। আওয়াজ লক্ষ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটে এলেন। না, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। গোলাগুলি চলছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তারা সদর দপ্তরের দিকে রওনা হয়।

তোফায়েল আহমদ তখন জেগে গেছেন। ফজলুল হক মনিকে এর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েল আহমদ ফজলুল হক মনির বাড়িতে টেলিফোন করেন, শেখ সেলিম টেলিফোন ধরলেন। বললেনঃ কালো পোশাক পরে এক দল সশস্ত্র লোক মনি ভাই ও ভাবীকে গুলি করেছে। ওরা এখনো বাড়ি ছেড়ে যায়নি। তোফায়েল আহমদ ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমার বাড়িও আক্রান্ত, যা পারিস কর।"

তোফায়েল ফোন করলেন আবদুর রাজ্জাককে।

ফোন করলেন, তিনি রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে। রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি ডাইরেকটর একজনকে তিনি ফোন করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও ফজলুল হক মনির বাড়িতে দ্রুত যাবার জন্য অনুরোধ করেন। ফোন করেন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে। ফোনে তিন জানালেনঃ আই এ্যাম সারাউন্ডেড বাই ট্যাংকস্।

আবার রক্ষীবাহিনীকে তিনি অনুরোধ করেন দ্রুত বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাবার জন্য। রক্ষীবাহিনী বলল, তাদের ট্যাংক দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তিনি পুনরায় ফোন করেন। তখন কেউ সে সময় ফোন ধরেনি।

রেডিওতে তখন বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর ডালিম ঘোষণা করছে।

পুনরায় ফোন করাতে রক্ষীবাহিনীর একটি গাড়ি এসে তাকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যায়।

রক্ষীবাহিনী তাদের গাড়িতে করে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের হত্যার প্রাক্কালে স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট তোফায়েল আহমদকে কেন সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন? তোফায়েল আহমদ সেখানে রক্ষীবাহিনীর বা সামরিক কোন নেতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? কি বলেছিলেন? আজ পর্যন্ত তা পরিস্কার করে তোফায়েল আহমদ কোথাও বলেছেন বলে আমার জানা নেই। রক্ষীবাহিনী কেন নিষ্ক্রিয় থাকল? বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর জন্য কেন তারা ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হল? কারা দায়ী তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। অথচ ফারুকের জবানীতে জানা যায়, রক্ষীবাহিনী যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিল।

রক্ষীবাহিনীর ব্যর্থতার বিষয়টি নিয়ে মনোভাবে কথা চলে আসছে। 'হু কিল্ড মুজিব' বইতে এ এল খতিব রক্ষীবাহিনীর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, তোফায়েল আহমেদ রক্ষীবাহিনীকে ফাইট করার নির্দেশ দিতে পারেননি কেননা তিনি বড্ড বেশি ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

তোফায়েল আহমদ অন্যত্র বলেছেন, রক্ষীবাহিনীকে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রক্ষীবাহিনী সে নির্দেশ পালন করেননি।

ঐ সময়ে উপস্থিত রক্ষীবাহিনীর জনৈক সদস্য বলেছেন, তোফায়েল আহমদ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান না করায় আমরা কিছুই করতে পারলাম না।

ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শুনে তোফায়েল আহমদকে টেলিফোন করেছিলেন। তোফায়েল নাকি তাকে বলেছেন, ওবায়দুর ভাই বলেছেন, যা হবার হয়েছে আর কি করার আছে।

ফারুক রক্ষীবাহিনীর দ্বিধাগ্রস্ততা বুঝতে পেরে ট্যাংকে ধানমন্ডির দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ফারুকের লোকেরা তাকে থামায় এবং বলে যে সব ঠিকঠাক মত সম্পন্ন হয়েছে।

ধানমন্ডির স্বচ্ছ লেকের জলে তখন শেষ রজনীর জ্বলজ্বল নক্ষত্রগুলো শিহরিত। বত্রিশ নম্বর রোডের সবুজ আকাশ প্রদীপ জ্বলা বাড়িটির মাথা বাড়িয়ে বেতস পাতার কচি কচি ডগাগুলো তখন দুলছে। পাশের নিষ্প্রভ বাতিগুলো শেষ রাতের অন্ধকারকে দু'হাতে সরানোর প্রয়াসে ব্যস্ত।

বত্রিশ নম্বর সড়ক ধরে রশীদের গোলন্দাজ বাহিনীর লোক এগিয়ে আসে দ্রুততার সঙ্গে। মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর (অব:) নূর-এর নেতৃত্বে একই সঙ্গে এক কোম্পানী ল্যান্সার বাহিনী অগ্রসর হয়।

প্রথমেই বাধা পায় তারা প্রেসিডেন্টের গার্ডদের তরফ থেকে। কিন্তু মেজর মহিউদ্দিন গাড়ি হতে নেমে আসে। তাদের পথ ছেড়ে দেবার আদেশ দিলে ল্যান্সার বাহিনীর লোকেরা তাদের স্যালুট করে পথ ছেড়ে দেয়। গার্ডদের ভেতরে কিছু ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের, তারা সংখ্যায় অল্প ছিল। তারা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরিকল্পিতভাবে পূর্বেই ফারুক এদের প্রেসিডেন্টের পাহরায় নিযুক্ত করেছিল। বিগ্রেডিয়ার মশারুল হক এদের ডিউটিতে নিযুক্ত করেন। বলাবাহুল্য মশারুল হক মোনায়েম খানের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন।

যা হোক প্রেসিডেন্টের সামরিক গার্ডবাহিনী বাধা প্রদান করেনি। বাধা প্রদান করেন একজন পুলিশ ডি. এস. পি। ঘটনাস্থলেই তাকে হত্যা করা হয়।

এরপর সৈন্যরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং চারিদিক থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

পুলিশ ডি. এস. পি. নিহত হলে মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর হুদা সদলে ঘরে ঢুকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ফারুক বলেছেন, 'শেখকে নীচে এসে আত্মসমর্পণের জন্য বলা হল। কিন্তু শেখ বাইরে না এসে ঘরের মধ্যে গিয়ে অবিলম্বে ফোন করলেন আর্মি চীফ জেনারেল সফিউল্লাহকে, প্রেসিডেন্টের

মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল জামিলকে, রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে। তারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছিল। সেজন্য তিনি উৎসাহিত হয়ে পুত্রদের প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র তুলে নেয়ার নির্দেশ দেন। এতে ঘটনাস্থলে আমাদের একজন লোক নিহত ও চারজন গুরুতর আহত হন। ফলে আমরা গুলি বর্ষণ করি এবং ঘরের মধ্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করি, সকলেই নিহত হন। ফারুকের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ নয়। সেদিন ঘটনার পর পর অনেকেই সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তারা যা বলেছেন তা হল-

ঃ পাহারারত পুলিশের লোকটি অভ্যর্থনা কক্ষে নিহত হয়েছে। শেখ কামালের লাশ পড়েছিল দরজার পাশে বারান্দায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বাঁক নিয়ে যেখানে সমান জায়গা সেখানে বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়ে ছিল। বঙ্গবন্ধুর ঘরের সামনে বেগমমুজিব হাঁটু ভেঙ্গে যেন পড়ে আছেন। আর বঙ্গবন্ধুর বড় খাটের পাশে জামালের মৃত দেহ পড়ে ছিল।

ফারুক বলেছে, বঙ্গবন্ধু ডি. এফ. আই. চীফ কর্ণেল জামিলকে টেলিফোন করেছিলেন। কথাটি সত্যি। ফোন পেয়েই কর্ণেল জামিল কয়েক জায়গায় ফোন করলেন।

কর্ণেল জামিল তখন গণভবনের সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়েই তিনি ড্রাইভার আইনুদ্দিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সোবহানবাগ মসজিদের নিকট তাঁকে বাধা দেওয়া হয় এবং তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রাক্তন সামরিক সচিব ও ডি. এফ. আই. চীফ কর্তব্য নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে জীবন বিসর্জন দিলেন।

পূর্বে ডি. এফ. আই. চীফ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। কিছুদিন পূর্বে তিনি আমেরিকা থেকে ঘুরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু তাকে অন্যত্র বদলী করেন। তার জায়গায় কর্ণেল জামিলকে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার রউফ ডি. এফ. আই-এর চার্জ তখন হাতে আটকে রেখেছে, দেই দেই করেও চার্জ দিচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৫ তারিখ চার্জ হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। এবং ঐ দিন কর্ণেল জামিলের ব্রিগেডিয়ার পদে প্রমোশনের কথা ছিল।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ঐ দিন সকালে যে সকল অফিসার প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন তারা হলেনঃ মেজর (অব:) ডালিম, মেজর আজিজ পাশা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর বজলুল হুদা, মেজর রশীদ চৌধুরী, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর শরীফুল হোসাইন, ক্যাপ্টেন কিসমত হোসেন, লে: খায়রুজ্জামান ও লে: আবদুল মজিদ।

এরাই মূলত ঃ চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ব্লুপ্রিন্ট মোতাবেক আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আক্রমণ করে। লে: কর্ণেল ফারুক ট্যাংকসহ দায়িত্ব গ্রহণ করে রক্ষীবাহিনীকে নিউট্রালাইজ করার। মেজর রশিদ তেজগাঁ বিমান বন্দরের পাহারা দেয়। মেজর (অব:) ডালিম ও ক্যাপ্টেন কিসমত যায় রেডিও দখল করতে। মেজর শাহরিয়ার ও লে: আবদুল মজিদ যায় মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। সুবেদার মুসলেম উদ্দিন তিন ট্রাক সৈন্য নিয়ে শেখ ফজলুল হক মনির বাসায় গমন করে। লে: কর্ণেল রশীদ, মেজর হুদা, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, লে: খায়রুজ্জামান সবাই বাকি সৈন্যদের নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নং রাস্তার প্রবেশ পথে মিরপুর রাস্তায় কালভার্ট। সেখানে কিছু সৈন্য রেখে তারা বঙ্গবন্ধুর পুরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে। এবং চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ করে। গুলির শব্দে কামাল ছুটে নেমে আসে। কাউকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় খুনীদের হাতে সে মারা যায়।

দরজা খোলাই ছিল। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর নূর কতিপয় সৈনিক নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। সিঁড়ির বাঁক নিতেই দেখল বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে বঙ্গবন্ধু কি বলেছিলেন তা আজও অজ্ঞাত। তবে ফারুকের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ না করে পুনরায় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। এবং কয়েক জায়গায় টেলিফোন করেন। পাঞ্জাবীটি পরে নেন। নেন তার প্রিয় পাইপটি।

কাগজপত্র বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার থেকে যদ্দুর বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু নিজেই নিচে নেমে আসছিলেন। কিন্তু কামালকে মেরে ফেলেছে এ সংবাদ পেয়ে ঘুরে পুনরায় উপরে উঠতে থাকেন। যতদূর জানা যায়, সুবেদার মোসলেম উদ্দিন শেখ মনিকে খুন করে। এসে এই অবস্থা দেখে সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বঙ্গবন্ধু থমকে দাঁড়ান। তারপর পড়ে যান সিঁড়ির উপর।

সময় সকাল ৫-৪০ মিনিট। পড়ে যাওয়া পুরা দেহটার উপর চলে ব্রাস ফায়ার। তারপর মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে চলতে থাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দুই কন্যা ব্যতীত পরিবারের সবাই নিহত হন।

বঙ্গবন্ধুর শরীরে ২৮টি গুলি লাগে। মুখে কোন গুলি লাগেনি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ও স্যান্ডো গেঞ্জী ছিল। পাঞ্জাবীর সাইড পকেটে ছিল তাঁর প্রিয় পাইটি। বুক পকেটে ছিল চশমা, যার একটি কাঁচ ভাঙা। কাঁধের উপর ছিল দুই আড়াই হাতের তোয়ালে।

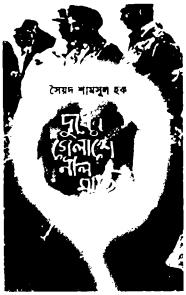

৮

বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। দোকানটা ছিলো সম্মুখেই। এই দোকানে কতোবার দাঁড়িয়ে একটা বই পুরো পড়ে ফেললেও দোকানী করে নি নিষেধ। আজো সেই মেয়েটি আছে কাউন্টারে বসে। বয়স তার বাইশ কি পঁচিশ, কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য এক পৌঢ়ার। আর তেমনি শীর্ণা সে। মুখখানি পাণ্ডুর।

এতোদিন এসেছি এ দোকানে। আমার মুখ তার চেনা হয়ে গেছে কবেই। বাংলাদেশ হলে কবেই একটা আলাপ হয়ে যোতো তার সঙ্গে। কিন্তু এখানে বড় অন্যরকম। আজো সে আমাকে প্রতিবারের মতই দেখে, মনে হয় এই প্রথম নতুন এক খদ্দের এলো দোকানে।

মনটা ভালো নেই আজ। মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে মনের মধ্যে বড় রকমের একটা জোয়ার।

কাউন্টারে বসা মেয়েটির দিকে এই প্রথম, এতো বছরের মধ্যে এই প্রথম, তাকিয়ে একটু হাসলাম।

সেও হাসলো। মেঘের ভেতরে এক পলকের জন্য একটি চাঁদ উঁকি দিয়েই আবার ঢাকা পড়ে গেলো মেঘে।

দোকানে ছিলো না কেউ। একাই আমি। পকেটে যথেষ্ট পয়সা নেই যে বই কিনি। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টির জন্যই আশ্রয় নিয়েছি কি এখানে তবে? নাকি আমার যে ভালোবাসা বইয়ের জন্য, সেই বই ছুঁয়ে কাটাতে চাইছি আমার মনের সকল অস্থিরতা।

একটার পর একটা বই দেখে চললাম। শেলফের মাথায় মাথায় লেখা আছে 'কবিতা', 'নাটক', 'ইতিহাস', 'উপন্যাস', 'রন্ধন প্রণালী', 'জীবনী', সমস্তই ভাগে ভাগে বিন্যস্ত, সজ্জিত।

হঠাৎ আমার পাশে উঠে এলো সে কাউন্টার ছেড়ে। 'বিশেষ কোনো বই খুঁজিতেছেন?'

'না, নহে।'

'ও।'

তবু সে ফিরে গেলো না কাউন্টারে।

এখন আমার মনের মধ্যে কবিতার সেই লাইনটি হঠাৎ ঝলসে উঠলো। সেই যে লাইনটা মাথার ভেতরে অবিরাম খেলা করছিলো-'দুধের গেলাশে নীল মাছি।' কিছুতেই পারছিলাম না, এই লাইনকে একটি ভাববৃত্তের ভেতরে স্থাপন করতে।

মেয়েটিকে বললাম, 'মন বড় অশান্ত আজ।'

বলেই মনে হলো, তাকে কেন দিচ্ছি এ সংবাদ? কি ভাববে সে? ভাববে কি, এই বৃষ্টির ভেতরে, দোকানের এই নির্জনতার ভেতরে, এই প্রথম তাকে একা পেয়ে, হতে চাইছি ঘনিষ্ঠ?

ঃতাড়াতাড়ি বললাম, আমার দেশ হইতে খুব খারাপ একটা খবর পাইয়াছি।'

চোখের পানি ফেলতে পারিনি সকাল থেকে। এখন আমার চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগলো।

অচেনা কেউ কখনো কখনো বড় কাছের হয়ে যায়। একবার দেখা হবে; আর হবে না কোনোদিন। তারই কাছে বুঝি সব উজাড় করে দেয়া যায়। মানুষ কি চেনা কারো কাছে তবে সত্যি সত্যি খুলে ধরতে পারে না তার ভেতরটা- সব-ভেতরের সবটা তো দূরে; ভেতরের এই এতোটুকু একটি বিন্দু?

মেয়েটি আলতো করে আমার হাতে রাখলো হাত। তারপর মুহূর্তেই সরিয়ে নিলো হাত।

বললো, 'আপনার হয় কোন্ দেশ?'

'বাংলাদেশ।'

'বাংলাদেশ? সেই যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিলো? স্বাধীনতার যুদ্ধ? র‍্যহমানের দেশ?' র‍্যহমান? বুঝতে পারলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই র‍্যহমান বলছে সে। পশ্চিমের দেশে নামের শেষটাই হয় পরিচয়ের প্রধান প্রথম নাম।

হ্যাঁ বলতে গিয়ে আরো কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো আমার তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে চোখ মুছে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে

বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সেই র‍্যাহমানের দেশের মানুষ হই।'

'অনেক অনেক লোক। তিরিশ লক্ষ লোক।'

বছরের পর বছর এখানে এসেছি। ভাবলেশহীন বলে দোকানের কাউন্টারে বসা এই যে মেয়েটিকে দেখেছি, এখন সে মুখ হয়ে উঠলো জননীর মতো মুখ। চোখ বুঁজলো সে। হয়তো নিজের অশ্রু এভাবেই কবর দিতে চাইলো এই নাম-না জানা মেয়েটি।

বললাম, 'হ্যাঁ, তিরিশ লক্ষ লোক দিয়াছিলো প্রাণ, দশ লক্ষ নারীকে ওরা করিয়াছিলো ধর্ষণ।'

মুখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটি।

বললাম, 'আমরা যুদ্ধ করিয়াছিলাম যাহার নামে যাহার ডাকে সেই মানুষটি তোমার ঐ র‍্যাহমান। শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা তাহাকে বঙ্গবন্ধু বলি। বাংলার বন্ধু। ফ্রেণ্ড অব বেঙ্গল'।

'বেঙ্গল?'

'বেঙ্গল, যে বেঙ্গল তোমরা বৃটিশেরা জানিতে, সে বেঙ্গল নহে। সে বেঙ্গল দুই ভাগ করিয়াছে তোমাদেরই সরকার উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে। এখন বেঙ্গল বিভক্ত। কিন্তু বেঙ্গলের প্রাণ আর পলিমাটি আমরাই পাইয়াছি। আমরা তাহাকে বলি বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সেই বাংলাদেশের বন্ধু। বেঙ্গল ভাগ হইয়াছে ভৌগোলিক অর্থে, রাজনীতি আর রাষ্ট্র সীমানার অর্থে। কিন্তু হাজার বছরের ইতিহাস ভাগ হয় নাই। বেঙ্গল ভাগ হইলেও বেঙ্গলি বাঙালীর বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর-'

আবার আমার চোখে অশ্রু ঠেলে উঠলো। জোর করে হেসে উঠলাম। হাসিও হয় কান্নার অধিক। এই মেয়েটি কি বুঝবে?

বললাম, 'আর আজ ভোরে, সেই র‍্যাহমানকে, বাঙালির বন্ধুকে হত্যা করা হইয়াছে।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মেয়েটি। তার পাণ্ডুর মুখে রক্তলাল দেখতে পেলাম।

আবার এক মুহূর্তের জন্য হাত স্পর্শ করলো সে আমার। বললো, 'দুর্গখিত আমি। বড় দু:খিত।'

ইংরেজের পক্ষে এর চেয়ে গভীর কষ্ট জানানোর বাক্য আর নেই।

বললো সে, 'একটা বই কিনিবে? আমি একটা বইয়ের কথা বলি?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

মেয়েটি উপন্যাসের শেল্‌ফ থেকে বের করে আনলো মোটা একটি বই। হাতে দিয়ে বললো, 'বইয়ের অধিক বড় বন্ধু নাই।'

বইটির মলাটে লেখা 'শত বৎসরের নির্জনতা'। বড় করে লেখকের নাম লেখা, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোয়েজ।

আগে কখনো এ লেখক বা এ বইয়ের নাম আমি শুনিনি।

মেয়েটি বললো, 'খুব ঘন একটি অরণ্য কল্পনা করুন। এতো ঘন যে গাছের পাতায় পথ দেখা যায় না। এমনই এই উপন্যাস। যুদ্ধের, মৃত্যুর, স্বাধীনতার,

মানুষের এই উপন্যাস। মানুষকে যাহা পতিত করে, মানুষকে যাহা উন্নত করে তাহারই এ উপন্যাস।'

আমার পকেটে পয়সা আছে কি নেই, তার কোনো পরোয়া না করে, বইটি সে প্যাকেটে মুড়ে দিলো আমার হাতে।

বললো, 'এ বই আপনাকে শান্ত করিবে, স্থির করিবে।' তারপর অপ্রত্যাশিত এক সংবাদ দিলো সে, 'আমারও যখন খুব কষ্ট হইতেছিলো একদা, এ বই পড়িয়া কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি।'

পকেট হাতড়ে দাম শোধ করলাম বইটার। টুংটাং করে হিশেব যন্ত্র উগরে দিলো বই কেনার রসিদ। যেন ঐ টুংটাং শব্দ আমাকে ফিরে নিয়ে গেলো এক মুহূর্তে প্রবহমান জীবনের ভেতরে।

বললাম, 'ধন্যবাদ।'

মেয়েটি আবার আমার হাত স্পর্শ করে বললো, 'দুঃখিত, আমি সত্যই দুঃখিত।'

বৃষ্টির ভেতরেই নেমে পড়লাম পথে।

শতবর্ষের নির্জনতা। বুকের ভেতরে এখন আমি ধারণ করে আছি গোরস্তান। বৃষ্টির জলে আমার চোখের জলে লণ্ডন দেখালো ঝাপসা। শুধু কি লণ্ডন? আমার দেশ? আমাদের ভবিষ্যৎ?

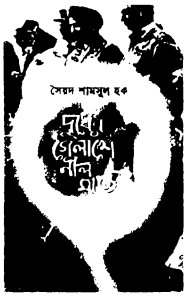

৯

রাত প্রায় ন'টা বাজে। মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখন হঠাৎ সব চুপচাপ, আর বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া। মৌনাদের বসবাস ঘরে লম্বা হয়ে বসে আমি পর্নো পান করে চলেছি। আর দূরে মেঝের ওপর বসে মৌনা রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজিয়ে চলেছে।

সৌমেনকে এসে আমি বাড়িতে পাইনি। অফিস থেকে মৌনা ফিরে আসবারও আগে সে বেরিয়ে গেছে।

মৌনাও আমার সঙ্গে পর্নো পান করছে। কাঁচা মৌরির নির্যাস এই সুরা আমার খুব প্রিয়। গেলাস খালি হয়ে গেছে মৌনার; আমারও।

বললাম, 'তোমাকে আর একটু দি।'

'না থাক।'

মৌনা যখন এইসব ছোটখাটো নিষেধ করে, তখন তার নাকটা অপরূপভাবে কুঁচকে আসে, ঠোঁট চাপা একটা হাসি ফুটে ওঠে, আর ক্রমাগত কিছুক্ষণ সে মাথা নাড়ে।

'দিলাম একটু।'

রান্নঘরে গিয়ে গেলাসে পর্নো ঢালছি, মৌনা এসে কাছে দাঁড়ালো।

'আমি বলি কি, আপনার তো খুব খিদে পেয়েছে, বরং খেয়ে নিন। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করি।'

'অপেক্ষা করতে হলে দু'জনেই করা যাক। তাছাড়া, খিদে আমার পায়নি।'

'রাত ন'টার খবর শুনবেন?'

'হ্যাঁ, টেলিভিশনটা দাও। নতুন কিছু খবর থাকতে পারে।'

আবার এসে ঘরে বসলাম; দু'জনে দু'জনার পুরোনো জায়গায়। দু'জনেরই গেলাশ প্রায় একই সময়ে ঠোঁট, ছুঁলো। আমার মনে হলো, একটা জীবন আমি বাস করছি। কিন্তু যেন শত বৎসরের এক গভীর নির্জনতার ভেতরে।

টেলিভিশনের খবরে নতুন কিছুই নেই। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত, খন্দকার মুশতাক নতুন রাষ্ট্রপতি, ঢাকায় কারফিউ। নতুনের ভেতরে এইটুকু যে,

লণ্ডনে কিছু বাঙালী বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে চড়াও হয়েছে, শেখ মুজিবের ছবি দেয়াল থেকে নামিয়ে ভেঙেছে, আর দূতাবাসের একজন কর্মচারী -স্থানীয় বাঙালদের সম্পর্কে দেশে যে গোপন রিপোর্ট পাঠাতো- তাকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে। টেলিভিশনে দেখালো তাকে বার করে দেবার দৃশ্য, আর শেখ মুজিবের ছবি গুঁড়িয়ে ফেলার ছবি।

কায়সার রশীদ চৌধুরীর কাছ থেকে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হলেও হতভম্ব হয়েছিলাম বার বার আমার মন কোন সে সুদূর অতীতের পানে ধেয়ে চললো। এই এক মহান ব্যক্তিত্বকে ঘিরে কত কথা, কত গান, কত স্মৃতি আর ইতিহাসের কত দূর্লভ মুহূর্ত।

সবকিছু ছাপিয়ে বার বার শুধু বঙ্গবন্ধুর একটা কথাই মনে হচ্ছিলো। ১৯৭৩-এর শেষভাগে এক সামরিক অভ্যুত্থানে চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আইন্দে তখন নিহত। প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু এ মর্মে বলেছিলেন, "আমাকে মারতে চাস্ মার্। কিন্তু তোরা কোনদিন শান্তি পাবি না।"

বাংলাদশের রাষ্ট্রদূতের ফোন নম্বর নিয়ে গোটা কয়েক "ইমিডিয়েট" কল বুক করলাম। প্রথমেই পেলাম তেহরান। রাষ্ট্রদূত দোহা গম্ভীর গলায় বললেন- "হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই খবর পেয়েছেন। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। এর বেশি জানি না।"

এরপরেই সুদূর ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে প্রেস কাউন্সিলার সৈয়দ নূরুদ্দিনের গলা।

"মুকুল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ঢাকার খবর খারাপ। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। 'ভয়েস অব আমেরিকা'য় একটু পরেই খবর শুনতে পারবে।"

রিসিভারটা রাখতেই শুধু ফোনের পর ফোন। সবাই ঢাকার বিস্তারিত সংবাদ জানতে আগ্রহী একমাত্র গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে অনেকক্ষণ আলাপ করে মনকে প্রবোধ দিতে সক্ষম হলাম।

আবার বিশ্রী শব্দ করে ফোনটা বেজে উঠলো। এবার স্বয়ং হাই কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতানের গলা, "মুকুল সাহেব, ঠিক ন'টার মধ্যে অফিসে আসবেন। এটা আমার নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করলে খুশী হবো।"

ফোনটা রাখতেই আমার সহকর্মী ও সুহৃদ মিহির সাহেবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

বললেন, "মুকুল সাহেব, আপনাকে কি হাই কমিশনার সাহেব ফোন করেছিলো? আমাকে তো' ঠিক সকাল ন'টার মধ্যে অফিসে যেতে হুকুম

করলো। এখন করি কি, বলেন তো? মনে হচ্ছে মিশনে একটা গন্ডগোল হবে। তবুও আমি ঠিক করেছি, অফিসে যাবোই। খালি ভয় আমার নতুন গাড়ি নিয়ে। তাই আজ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।"

জবাবে বললাম, "এখন মাথা ঠান্ডা করে কাজ করার সময়। 'গার্ডিয়ান' কাগজে বিজ্ঞাপন দেখার পর আমার মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক।'

আজ হাই কমিশনে কিছু একটা গন্ডগোল হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে সব কিছুই বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশ। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা বৃটিশ পত্র-পত্রিকা আর বেতার-টিভিতে পাবলিসিটি নেয়ার জন্য আজ আমাদের অফিসে কিছু একটা করবেই। এরা বোঝাতে চাইবে যে, প্রবাসী বাঙালীরা আর মুজিবকে সমর্থন করে না।

উত্তেজিত অবস্থায় ভদ্রলোক আমার কথাই শুনতে রাজী নন। বার বার একই অনুরোধ, তাঁকে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উপায়ন্তর বিহীন অবস্থায় বললাম, "আপনি হচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগের লোক এবং লন্ডনে বেশ কিছুদিন ধরে রয়েছেন। তাই মনে হয় চীনপন্থীরা ছাড়াও 'জাসদ' আর 'জনমত'-ওয়ালারা আপনার উপর খাপ্পা হয়ে আছে। তাই একটা 'ক্যাজুয়াল লীভ'-এর দরখাস্ত পাঠিয়ে বাসায় বসে সবকিছু 'ওয়াচ' করুন। সেটা সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি।"

আমি বোঝাতে ব্যর্থ হলাম। শেষ অবধি মিহির সাহেবকে বাসা থেকে উঠিয়ে অফিসে রওয়ানা হলাম। যখন কুইন্স গেট-এর অফিসে যেয়ে পৌঁছালাম তখন সকাল ন'টা বাজার মিনিট কয়েক বাকী। লক্ষ্য করলাম আমাদের হাই কমিশনের ভবন অসংখ্য বৃটিশ পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। আর ঠিক গেটের সামনে ওঁতপেতে বেশ ক'টা টিভির ক্যামেরা। একটু দূরে গাড়ি পার্ক করে অপিসে ঢুকে এক অবর্ণনীয় অবস্থা দেখলাম। টেবিল-চেয়ার, শেলফ-এর বই, এমনকি দেয়ালে টানানো নিহত প্রেসিডেন্ট মুজিবের ফটো-সবকিছু ভেংগে একাকার হয়ে রয়েছে। একেবারে লন্ডভন্ড অবস্থা। মিশনের নিরাপত্তা প্রহরীর কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত শুনলাম। সকাল আটটা নাগাদ প্রায় একশ'জনের এক উত্তেজিত জনতা (প্রবাসী সিলেটি বাঙালী অনুপস্থিত) বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস আকম্রণ করায় এই লংকাকাণ্ড। উল্লেখ্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে হাই কমিশন কর্তৃক আহবান না করা অবধি বিধিমত মিশন ভবনে পুলিশের প্রবেশাধিকার নেই বলেই এ অবস্থা। এ জন্যই আক্রমণকারীরা মিশনের ভিতরে ঢোকার পর ইচ্ছামতো ভাংচুর করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ধরনের এক অবস্থায় অফিসের সব রকম কাজকর্ম বন্ধ। চারপাশে ছোট ছোট জটলা। একজন সহকর্মীর রুমে রেডিওর নিউজ শুনতে গেলাম। প্রতি অর্ধ ঘন্টা পর পর প্রচারিত আন্তর্জাতিক সংবাদে বাংলাদেশ সম্পর্কে ফলাও করে শুধু মাত্র সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিব নিহত এবং এই দেশটির সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এটুকু ছাড়া বিস্তারিত কিছুই নেই। তবে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বার বার লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব ফারুক চৌধুরীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। জনাব চৌধুরী এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার ফলে বাংলাদেশ একনায়কত্বের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

একটু পরেই হাই কমিশনার-এর কামরায় ডাক পড়লো। এককালের প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ-এর কথা হচ্ছে, তিনি থাকতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর 'ইন্টারভিউ' বৃটিশ রেডিও-টিভিতে প্রচাতি হচ্ছে কিভাবে?

প্রেস কাউন্সিলারি হিসেবে তাঁকে অনেক করে বুঝালাম। এখন ঢাকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোনো যোগাযোগই নেই। ফলে বাংলাদেশে কি হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কোনোরকম মন্তব্য করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।

কিন্তু শ্রদ্ধাভাজন সৈয়দ সাহেব বৃটিশ প্রেস-এ 'ইন্টারভিউ' দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নীচের ফুটপাতেই তখন রিপোর্টাররা ঘোরাঘুরি করছিলো। দরজা বন্ধ করে তিনি ইংরেজী রিপোর্টারদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। দুপুরের পর থেকে রেডিও-টিভিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনারের মন্তব্য প্রচারিত হতে শুরু করলো। ভাষাটা একটু তফাৎ হলেও দু'জনের মোদ্দা কথাটা একই।

ঊনসত্তরের আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবদুস সুলতান কাউন্সিল মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করলে বঙ্গবন্ধু তাকে আওয়ামী লীগে স্থান দিয়ে সত্তরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের টিকিটে জয়যুক্ত করেছিলেন। আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃটেনের মতো জায়গায় হাই কমিশনার হিসেবে সৈয়দ সাহেবকে পাঠিয়েছেন- সম্ভবত এটা ছিলো বঙ্গবন্ধুর অন্যতম "অপরাধ'। এতো করে ও ভদ্রলোক তাঁর চুক্তিভিত্তিক চাকরির মেয়াদ বাড়াতে পারেননি। এটা নিয়তির পরিহাস!

সেদিন দুপুরের লাঞ্চ-এর আগেই লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে আরও ২টি নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হলো।

সকালে যারা মিশন আক্রমণ করেছিল, তাদের ৫/৬ জন নেতা এলো ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব ফারুক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। এদের

প্রথম দাবী হচ্ছে, সকালে মিশন আক্রমণের সময় বিবিসি এবং আইটিভির ক্যামেরাম্যানরা ছবি নিতে পারেনি। তাই মিশনের ভিতরে আরেক দফা ভাংচুর করা হবে এবং ছবি নেয়ার জন্য টিভি ক্যামেরাম্যানদের এবং প্রেস ফটোগ্রাফারদের 'এলাউ' করতে হবে।

স্বল্পকালীন আলোচনার পর মিশনের কর্তৃপক্ষ অফিসের ভিতরে আরেকদফা ভাংচুর-এর অনুমতি প্রদান করলেন।

সে এক চরম লজ্জাকর আর অকল্পনীয় ব্যাপার। নিহত প্রেসিডেন্টের ফ্রেমওয়ালা ভাংগা আর ভালো অনেক ক'টা বড় ফটো এনে ডেপুটি কমিশনারের বিরাট কামরার চারটা দেয়ালে টানানো হলো। টিভি ক্যামেরাম্যান আর প্রেস ফটোগ্রাফাররা ঘরের এক কোণায় 'পজিশন' নেয়ার পর আকস্মিকভাবে শুরু হলো এক পৈশাচিক ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট মুজিবের ফটো ভাংগা এবং পা-দিয়ে ফটোগুলো সবার সামনে দলিত-মথিত করলো।

এদিকে আক্রমণকারীরা হাই কমিশন-এর একজন উর্ধ্বতন অফিসার কূটনীতিবিদকে মিশন থেকে বহিষ্কারের দাবী জানালে আশ্চর্যজনকভাবে মিশন কর্তৃপক্ষ এতে সম্মত হয় এবং অনতিবিলম্বে উক্ত অফিসারকে (জনাব এম এম খান মিহির) অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

বিকেল ৩টা নাগাদ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সংঘটিত এসব ঘটনা প্রদর্শিত হলো বৃটিশ টেলিভিশনে।

ভাবলাম বিবিসিতে গেলে বাংলাদেশের কিছু খবর পাওয়া যাবে। বাস টারমিনালে যেয়ে একটা খালি বাসের দোতলায় বসে সিগারেট ধরালাম। ভর দুপুর, উপরের তলায় আমি শুধু একাই বসে। মিনিট কয়েক পরেই বাসটা সেন্ট্রাল লণ্ডনের দিকে রওয়ানা হবে। এমনি সময়ে বিরাটদেহী এক জ্যামেইকান-বৃটিশ বাসের উপরের তলায় এসে বসলো। হাতে তার জ্বলন্ত সিগারেট। মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কিছু গল্প করে সময় কাটাতে চায়। এরপর দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা নিম্নরূপ:

জ্যামেইকান ঃ বেআদবি মাফ করবেন। আমি কালো হলেও এদেশেই আমার জন্ম। আমার পূর্ব পুরুষদের জোর করে ক্রীতদাস হিসেবে এদেশে নিয়ে এসেছিলো। এখন আমরা বৃটিশ নাগরিক। আপনি কোন দেশের?

উত্তর ঃ আপনি আন্দাজ করুন আমি কোন দেশের লোক হতে পারি?

জ্যামেইকান ঃ দেখুন আমার আন্দাজ সঠিক কিনা। আপনি নিশ্চয়ই আফ্রিকার ঘানা থেকে এসেছেন। কেমন কিনা?

উত্তর ঃ আপনার জবাব সঠিক হয়নি। আবার চেষ্টা করুন।

জ্যামেইকান ঃ (বিকট শব্দে হেসে) আমি একটা আহম্মক নাকি? আপনি তো' পিরামিডের দেশের লোক? ইজিপ্সিয়ান।

উত্তর ঃ এবারও ঠিক হলো না। আবার চেষ্টা করুন। আমার দেশ আরও পূর্বে।

জ্যামেইকান ঃ (একটা সিগারেট অফার করে নিজেও একটি ধরিয়ে) আমি একটা আস্ত গর্দভ। আপনি হচ্ছে গান্ধীর দেশের, ইণ্ডিয়ান' এবার ঠিক হয়েছে তো?

উত্তর ঃ আপনি আবারো ভুল করেছেন। আমি 'ইন্ডিয়ান' নই। তবে 'ইণ্ডিয়া' আমাদের প্রতিবেশি। এবার বলুন কোন দেশের?

জ্যামেইকান ঃ সরি, আমি পারলাম না বলতে। তা হলে এবার আপনি নিজের দেশের পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ এতবার চেষ্টা করেও পারলেন না? আমি হচ্ছি বাংলাদেশের লোক। বাঙালী।

এই জবাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বোঝার আগেই বাসের মধ্যে এক অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটে গেলো। সঠিকভাবে বর্ণনা দেয়া মুশকিল। মুহূর্তে জ্যামেইকান ভদ্রলোকের চেহারা থেকে কর্পূরের মতো সব হাসি উবে গেলো। তিনি তখন রাগে অগ্নিশর্মা সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ইউ আর ফ্রম বংলাদেশ? (আপনি বাংলাদেশের লোক?) ইউ হ্যাভ ব্রুটালি কিলড শেখ মুজিব? (আপনারাই শেখ মুজিবকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন?) আই হেইট টু টক্ উইদ ইউ। (আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা করি।) থু: থু:। থূ: থূ: থূ:।

হুড়মুড় করে জ্যামেইকান একেবারে বাস থেকেই নেমে গেলেন। প্রমাণ করে গেলেন, সমগ্র বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর্বত প্রমাণ 'ইমেজ' অটুট আর অক্ষুণ্ন রয়েছে।

উঠে গিয়ে টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলাম। তখন অস্বস্তিকর এক স্তব্ধতা সারাটা ঘরে সমস্ত কিছু তার অস্থির আঙুলে ওলটপালট করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট গলায় মৌনা বললো, 'খেয়ে নেবেন?'

উত্তর দিলাম না। সেও আর অনুরোধ করলো না।

হঠাৎ আমার হাঁটতে ইচ্ছে করলো খুব। মৌনার বসবার ঘরটা বেশ লম্বা, গাঢ় লাল কার্পেট পাতা। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম কয়েকবার। দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বইয়ের তাকে বই, ঘরের কোণায় লতানো গাছ।

'কি আশ্চর্য-মৌনা বললো, 'মুজিবের ছবিটা ভেঙে ফেললো?'

'বাহ্, মুজিব আর নেই যে!'

চমকে আমার দিকে তাকালো মৌনা। ও বুঝতে চাইছে, আমি ঠাট্টা করছি কিনা।

বললাম 'মুজিব মরে গেছে। তাঁর ছবিতে হাত দিলে এখন উঠে এসে কিছু করার ক্ষমতা আর নেই তাঁর। মুজিব এখন একপিণ্ডু মাংস, আর সে মাংসেও এতোক্ষণে পচন ধরেছে, এ কথা বিশ্বের কারো জানতে আজ বাকি নেই, বুঝেছ, মৌনা?'

মৌনা উঠে দাঁড়িয়ে, কাছে এসে আমার দিকে হাত বাড়ালো।

'গেলাশটা দিন।'

'গেলাশ?'

'তখন থেকে একটানা খেয়ে চলেছেন। আর খেতে হবে না।'

'ভাবছ, মাতাল হয়ে গেছি।'

মৌনা অস্ফুট একটুখানি হাসলো। 'কই, দিন গেলাশ।'

গেলাশটা ওর হাতে দিলাম। দিতে দিতে বললাম, 'না, মাতাল হইনি, মৌনা। মাতাল হবার ইচ্ছেও নেই। এমনিতেই আমি মাতাল। আজ কিছুতেই নিজের ওপর বল পাচ্ছি না।'

'সোফায় গিয়ে বসুন।'

মৌনা দু'হাতে দু'টি গেলাশের মৃদু ঠোকাঠুকি করে বললো। বসলাম, কিন্তু নিজে সে দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মাঝখানে। সিগারেট বার করলাম, মৌনা বললো, 'ধোঁয়ায় আমার ঘর ভরে ফেলেছেন। ক'টা খেলেন তখন থেকে?'

'গুনিনি। সাতটা? আটটা?'

'এতো সিগারেট খান?'

'সিগারেট খেতেও মানা করছো?'

'মানা করবো কেন? কিন্তু ধোঁয়ায় যে ঘর ভরে গেলো।'

'তোমার পছন্দ নয়?'

'জানালাটা একটু খুলে দি।'

জানালা একটু ফাঁক করে বুকভরে নিশ্বাস টেনে মৌনা বললো, 'বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ও এতোক্ষণ করছে কি?'

মৌনার এই এক অভ্যেস লক্ষ্য করেছি, সৌমেনের নাম পারতে উচ্চারণ করে না। কিন্তু আমার বড় অস্থির লাগছে। না সুরা, না সিগারেট, না মৌনাকে বলতে পারা আমার শত বৎসরের নির্জনতার কথা। তাহলে করবোটা কি?

কথা? শুধু কথা? কথাই অদ্বিতীয়, অনন্য সেতু?

উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির পায়চারি করতে করতে বললাম, 'মৌনা, জানো, মাঝামাঝি কিছুই আমরা করতে জানিনে। আমরা বাঙালীরা কাউকে বড় করতে চাইলে দেবতার চেয়েও বড় করে তুলি, ছোট করতে চাইলে কুকুরের চেয়েও কম করুণা তার জন্যে বরাদ্দ রাখি।'

'সৌমেন এখনো আসছে না কেন?'

মৌনা কি অন্তর্যামী? সৌমেনের নাম উচ্চারণ করলো? কিন্তু সৌমেনের কথা আমার কথার পিঠে কেন?

ও ওর দুঃখ করে চলেছে, আমি আমার। ও ওর ভাবনা ভাবছে, আমি আমার। ও ওর অভাবের ভেতরে, আমি আমার। তারপর অতর্কিতে দু'জনের যদি মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়? বিশাল একটা শাদা চ্যাপটা চাঁদের নিচে এবং চারদিকে কিছু না, না বাড়ি না গাছ, না কারো ছাড়া? তাহলে?

'যার গান তুমি এতোক্ষণ বাজাচ্ছিলে, মৌনা, রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব না বলা পর্যন্ত বাঙালীর বিশ্বাস হয় না যে সত্যি সত্যি তিনি বড় কবি।'

'বাড়িতে লোক আসবে জানে, তবু দেরি করছে।'

'শ্যামল বলে শান্তি নেই বাঙালীর, বলবে, সুশ্যামল। কোমল বলে তৃপ্তি নেই, সুকোমল। শীতল? অসম্ভব। সুশীতল!'

'দেরি হচ্ছে, তো একটা ফোন করলেও তো পারে।'

'হত্যাই যদি করতে হয় তো একজনকে কেন, তার পরিবারশুদ্ধ নামিয়ে দাও,. নইলে হত্যা হলো কোথায়?' আমি হঠাৎ বলে ফেলি বুকের ভেতর দমকা হাওয়াটা ঠেলে দিয়ে।

একটু থমকে, মৌনা বললো, 'ক'টা বাজে দেখুন তো।'

'দশটা বাজে।'

মৌনা আমার সমুখে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'কিছু মনে করবেন?'

'কি? কেন? বলো?'

'চলুন না, পথের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই। আমার কেমন চিন্তা হচ্ছে। সেদিন আমাদের চেনা এক ভদ্রলোককে ইংরেজ ছেলেরা ধরেছিলো। ইউস্টোন স্টেশানের কাছে। ঘুষি মেরে চশমা ভেঙে দিয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে তিনটে সেলাই দিতে হয়েছিলো।'

'পাগল। সৌমেন হুঁশিয়ার ছেলে।'

'ওকেও তো একবার ধরেছিলো। আমার বিয়ের আগে।'

'তুমি খামোকাই ভাবছো, মৌনা।'

মুখে ওকে আশ্বাস দিলেও মনের ভেতরে আমারও একটু শংকা হলো। আমি নিজেও তো রাত ন'টার পরে ট্রেনে বাসে পারতপক্ষে চাপি না; যেখানে বাজে ভিড় সেখান দিয়ে হাঁটি না। লণ্ডনে পা দেবার পরই একজন আমাকে ক'টা নিয়ম বলে দিয়েছিলো; তার একটা হচ্ছে, দু'জন ইংরেজও যদি মারামারি করে তো সেখানে উঁকি দেবে না, কারণ পুলিশ এলে ধরবে তোমাকে।

মৌনা আমার মুখে ভাবনার কালি লক্ষ করে আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো।

'চলুন, মোড়ে যাই।'

মোড়ে এসে আমরা অবাক। বৃষ্টিতে যে বিশ্ব কখন ডুবে বসে আছে আমরা টের পাইনি। গাড়ি লরী বাস জমে গেছে পথের ওপর। লোকেরা হাঁটু পর্যন্ত পানি ঠেলে আসছে। ট্রাফিক বাতি বিকল হয়ে গেছে বলে পুলিশ হাত দিয়ে গাড়ি পার করাচ্ছে একেবারে আমাদের দেশের মতো।

'কি কাণ্ড। কখন হলো এতো বৃষ্টি।'

'এ যে একেবারে কলকাতা।'

'ঢাকাতেও এই হয়।'

পথচারী একজনের কাছে শোনা গেলো, ট্রেনের তিনটে টিউব লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। পানি ঢুকে পড়ার জন্যে। বাস যে কোথায় কোনটা যাচ্ছে না, বলা মুশকিল। ক্যামডেন টাউন তেকে হ্যাম্পষ্টেডের মাঝখানে কয়েক জায়গায় পথের ওপর পানি প্রায় কোমর ছোঁয়া।

এখানেও দেখলাম অনেকগুলো বাড়ির একতলা হাতখানেক পানিতে ডুবে গেছে।

'কি হবে এখন? ও ফিরবে কি করে?'

বললাম, 'খামোকাই তুমি মারপিটের ভয় করছো। দেখলে তো, জল জমে গেছে বলেই আসতে দেরি হচ্ছে।'

'কোথায় যে আটকে পড়লো।'

মৌনা গলা উঁচু করে দূরে কাছে ভিড়ের ভেতরে খুঁজতে লাগলো, যদি সৌমেনকে দেখা যায়। আকাশ এখনো থমথমে হয়ে আছে। হয়ত দুপুর রাতে আবার বৃষ্টি হতে পারে।

'সৌমেন গেছে কোথায় জানো?'

'না, সেইতো মুশকিল। আপনি ফোন করার পর ওকে ফোন করে বলে দিলাম যে আপনি আসছেন, হ্যাঁ? বললাম ফ্রিজ থেকে মাংস বার করে রাখলে এসে রান্না করবো। তারপর সাড়ে চারটের দিকে ও ফোন করলো। বললো, বেরুচ্ছি। পাস করেছে তো, কি একটা কাজের খোঁজ পেয়েছে কোথায়, তাই

যাচ্ছে। বললাম, দেরি করো না, আপনি আসবেন। তারপর এসে রান্না করছি, আপনি এলেন। এদিকে পথঘাট যে সব ভেসে গিয়েছে তা কে জানে?'

সারাক্ষণ মৌনার চোখ অস্থির পাখির মতো ভিড়ের ভেতরে ডানা ঝাপটাচ্ছে। বললাম, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, মৌনা। ঠাণ্ডাও পড়েছে। তারচেয়ে বাসায় চলো। সৌমেন হয়তো ফোন করবার চেষ্টা করছে।'

নিতান্ত অনিচ্ছুক পায়ে মৌনা ফেরার দিকে মুখ করলো।

ঘরে ফিরে ওকে আর জিজ্ঞেস না করেই আমাদের গেলাশ দু'টোয় পর্নো ঢাললাম। জিজ্ঞেস করলেই নিষেধ করতো নির্ঘাৎ। এখন যখন গেলাশ তুলে দিলাম হাতে, মৌনা নিঃশব্দে মুখ দিলো।

পর পর দুটো চুমুক দিয়ে মৌনা বললো, 'গান শুনবেন, না ভাত খাবেন?'

'গান শুনি।'

'আমি বলি খেয়ে নিন। ওর জন্যে বসে থেকে লাভ নেই। আপনার কষ্ট হচ্ছে।। আমি বরং ও এলে খাবো।'

'মনে হয় তোমারও খিদে পেয়েছে, মৌনা। এসো, দু'জনেই খাই।'

'সে হয় না।'

'সৌমেন হয়তো যেখানে গেছে সেখানে খেয়ে নিয়েছে।'

'কক্ষণো না। তাহলে ফোন করে বলতো।' মৌনা জোরগলায় প্রতিবাদ করে উঠলো। 'তাছাড়া খাবে কেন? বাড়িতে আপনি এসেছেন, আপনাকে ফেলে কেন খাবে?'

'বারে, খিদে পেলে খাবে না? রাত হয়নি?'

'তাহলে এতোক্ষণে চলে আসতো।'

'আসতে পারছে না। ধরো, ট্রেন বাস কিছু চলছে না যেখানে গেছে সেখানে থেকে।'

'ফোন করতো তাহলে।'

'ধরো, ফোনও বিকল হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। লণ্ডন বলেই কি কিছু বিকল হতে নেই নাকি?'

দুশ্চিন্তায় মৌনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

'হয়তো ঠিকই বলেছেন, ফোনও খারাপ।'

'আমার তো মনে হয়, খুবই অসুবিধেয় পড়েছে সৌমেন।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কি? তুমি আমি খেয়ে নি। তারপর ওর জন্যে অপেক্ষ করি। এসো, ভাতটা চাপিয়ে দেবে।'

মৌনা রান্নঘরে গেলো। তার গেলাশ পড়ে রইলো বসবার ঘরে। আমি সেটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। চাল ধুচ্ছে মৌনা। আমাকে দেখে বললো, 'বসুন না গিয়ে, আমি চাপিয়ে চলে আসছি।'

'এখানেই দাঁড়াই। কথা বলি।'

কিন্তু তারপর না আমি কিছু বললাম, না মৌনা। সুমসুম করছে গ্যাসের আগুন। তার ওপর টগবগ করছে চাল। ফ্রিজ থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন উঠছে থেকে থেকে। আর কোনো শব্দ নয়, জীবিতের কোনো কণ্ঠস্বর নয়। সিংহটা কিসের জন্যে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলো অরণ্যের সেই স্তব্ধতার ভেতরে? আরো এক সিংহের কথা আমরা জানি, যার কংকাল পড়ে ছিলো কিলিমানজেরোর তুষার ঢাকা শিখরে। ধাঁধা ছিলো, সিংহটা ঐ অত ওপরে বরফের ভেতরে কি খুঁজছিলো?

মৌনাই প্রথম কথা বললো।

'আপনার কতোদিন হয়ে গেলো বিলেতে?'

'প্রায় চার বছর।

'এ-ত দি-ন?'

'চার এখনো পুরো হয়নি।'

'কেন এসেছিলেন?'

'প্রথমে মনে হয়েছিলো, একটা কিছু থেকে পালাতে। কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি, একটা বিশেষ কিছু পাবো, আমার ভাগ্যে এটা লেখা ছিলো বলেই এসে পড়েছি।'

'বুঝতে পারলাম না'।

'বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। অনেক পেছন থেকে শুরু করতে হবে। তবে কথা হচ্ছে, বিলেতে আছি বলে আমার কোনো অনুতাপ নেই, যেমন অনেকেরই আছে, অনেকেরই হয়।'

'আমার এখানে একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'দেশে যেতে ইচ্ছে করে?'

'হ্যাঁ. দেশে যেতে ইচ্ছে করে।'

'গেলেই পারো।'

'ইচ্ছে থাকলেই কি সব সময় সম্ভব হয়?'

'সম্ভব করবার ইচ্ছে থাকলে সম্ভব করা যায় বৈকি?'

'ভাত হয়ে গেছে। দিয়ে দি?'

'দাও। আমি টেবিল গোছাচ্ছি।'

মুখোমুখি দু'জনে খেতে বসলাম। ভাতে হাত দিয়েই মৌনা বললো, 'এখনো এলে ও আমাদের সঙ্গেই বসে খেতে পারতো।'

তার মুখের কথা শেষও হয়নি, এমন সময় ঘর চমকে দিয়ে বেজে উঠলো টেলিফোন।

'নিশ্চয়ই ও।'

মৌনা এঁটো হাতে গিয়ে টেলিফোন ধরলো। বসবার ঘরেই খাবার জায়গা, আর এখানেই টেলিফোন। মৌনা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে টেলিফোনে কান রেখে বললো, 'পাবলিক ফোন থেকে করছে। পয়সা ঢোকাতে পারছে না। এই যা, কেটেই গেলো।'

মৌনা ওখানেই, টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। শরীরের ভার এ পা ওপায়ের ওপর বদল করে চললো আবার ফোনের অপেক্ষায়। ফোন আবার বেজে উঠলো।

'হ্যালো। তুমি? কোথায় তুমি? ঘড়ি দেখেছো, রাত ক'টা?'

আমি ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সৌমেনের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার ওখানে না থাকাটাই শোভন। আমি দেখতে লাগলাম তৈজসপত্র, মশলার কৌটো। যত্নের সঙ্গে সব সাজানো, দোকানের মতো ঝকঝক তকতক করছে। রান্নাঘরের জানালায় লতিয়ে উঠেছে একটা লতাগাছ, ছবির মতো লাগছে। মৌনার গলা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। তার কণ্ঠের শব্দগুলো কেমন সংক্ষিপ্ত, আহত এবং মরণশীল মনে হচ্ছে।

তারপর সব চুপ হয়ে গেলো। সৌমেনের সঙ্গে কথা শেষ হয়ে গেছে। আমি ফিরে এসে টেবিলে বসলাম। মৌনা দরকারের চেয়ে বেশি মনোযোযাগ দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললো, 'ও রাতে ফিরতে পারছে না।'

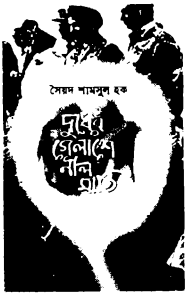

১০

তাহলে কি করা যায়? সৌমেন যদি থাকতো, আজ রাতে আমি এখানেই থেকে যেতাম। সৌমেন আজ নেই, আমার এখানে যতোই থাকতে ইচ্ছে করুক, থেকে যাওয়াটা কারো দিক থেকেই সহজ নয়। আমি তো এই রকমই একটা সময়ের অপেক্ষা করছিলাম যখন মৌনা একা এবং আমার দেহ সবচেয়ে সচেতন। মৌনাকে আমি আমার দেহের ভেতরে চাই, এ কথাটা উচ্চারণ করলে চারদিকের দৃশ্য, সম্পর্ক এবং সংস্থাপনের কি বদল ঘটবে, আদৌ ঘটবে কি-না, আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবু চেয়েছি, একটা মুহূর্ত, একটা রাত, অবিকল এই রকম। আর, এখন তার ভেতরে এসেও আমি বেরুবার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করছি।

না, এভাবে নয়, আজ নয়, এখন নয়; মৌনাকে আজ আমি স্পর্শ করবার জন্যে হাত কিছুতেই বাড়াতে পারাবো না। যদি বাড়াই তো অনিবার্যভাবে মনে হবে, তার একাকীত্বের সুযোগ আমি নিয়েছি।

'আমাকেও যেতে হয়।' মৌনাকে বললাম।

'কি করে যাবেন?'

মৌনা কি সত্যি সত্যি জানবার জন্যে উদ্বিগ্ন? না, নিতান্তই এ তার কণ্ঠের ব্যায়াম?

'দেখি, কি করে যাই।'

'ট্রেন বাস সবইতো বন্ধ শুনলাম।'

'খোলা থাকলেও বলেছি তো, এতো রাতে আমি ট্রেনে বাসে উঠি না। ইংরেজের হাতে বেঘোরে মার খাবার শখ আমার নেই।'

'তবু এদেশে পড়ে আছেন?'

'আছি। কোথায় না মার খাচ্ছি? সব জায়গাতেই পিঠ বাঁচিয়ে চলতে হয়। বাংলাদেশে, ভারতে, বিলেতে। যাবো কোথায়?'

'সে না হয় হলো, এখন বাসায় যাবেন কি করে?'

'ট্যাকসি করে। ফোন করে দিলেই মিনিক্যাব চলে আসবে। আছে না তোমার কাছে এ পাড়ার মিনিক্যাবের নম্বর?'

'আছে।'

'দাও, ফোন করি। ক্যাব আসতে সময় তো নেবে।'

'ফোন না হয় করবেন, পয়সা আছে?'

'ট্যাকসির ভাড়া? না থাকলে চেয়ে নিতাম। তুমি বুঝি দিতে না?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'এটা এমন কোনো দার্শনিক প্রশ্ন নয় যে তপস্যা করে উত্তর পেতে হবে। আমার কাছে ভাড়া না থাকলে বিনাদ্বিধায় হাত পাততাম, সেটুকু সম্পর্ক তোমাদের সঙ্গে আছে বলেই মনে করি। আর চাইলে তুমি যে দিতে, তাও নিশ্চিত। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কেন?'

মৌনা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিলো না। তার গেলাশে কিছুটা পর্নো পড়ে ছিলো, হাতে নিয়ে চুমুক দিলো, ঠোটের কোণ মুছলো বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'সত্যি জবাব দেবেন? ট্যাকসি করে গেলে আপনার মনে হবে না, টাকাটা অপচয় হলো,? নষ্ট হলো? তারচেয়ে এখানে থেকে গেলেই ভালো ছিলো।'

কথাগুলো সহজ, কিন্তু মৌনার মনোভাব বোঝা আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়লো। ও কি জানতে চায়, আমি আজ রাতে এখানে থেকে যেতে চাই কি-না? নাকি, ও চায় আমি থেকে যাই? কিন্তু আমি ওকে যতোটুকু জানি, এভাবে ও বলবে না। তাহলে কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা প্রসঙ্গ আছে যা আমি ঠাহর করতে পারছি না? বুঝতে পারছি না। তারও আছে মাংস এবং মাংস বড় প্রবল ও গোলাপি।

'চুপ করে কেন?' মৌনা আমাকে তিরস্কার করলো আমারই উদ্ধৃতি দিয়ে, 'আমি তো কোনো দার্শনিক প্রশ্ন করিনি।'

'না। আমি ভাবছিলাম, আদৌ জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'কৌতূহল।'

'যেটা প্রয়োজন, তার জন্যে টাকা কেন, কোনো কিছুই অপচয় নয়। না মৌনা, এই যে আমি এখন ট্যাকসি করে যাবো, আমাকে যেতে হবে, এটাই স্বাভাবিক, আর তাই যাবার মাশুলটা অপচয় নয়। ওটা দেবার তাই দিতে হবে এবং দেব এবং তার জন্যে এতোটুকু ভাববো না এবং ট্যাকসি থেকে নেমে গেলেই ভুলে যাবো।'

'আপনি কি চটে গেছেন যে এতোগুলো 'এবং' ব্যবহার করলেন?'

'বারে, চটবো কেন? তুমি একটা প্রশ্ন করেছো, তার উত্তরটা গুছিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। তাছাড়া আমি বাঙাল তো, কথার দোষ ঢাকার জন্যে মনের

ভেতরে উৎকণ্ঠা আছে সারাক্ষণ। তাই কখনো কখনো আমার কথা হয়তো বেশি সাজানো মনে হয়।'

কথাগুলো বলতে বলতে এবং শেষ করবার আগেই টের পেলাম, মৌনা আমার কথা কিছুই শুনছে না। আমার দিকে তাকিয়ে থেকেও আমার দিকে সে তাকিয়ে নেই। আর আমার যখন বলা শেষ হলো, তখনও সে আমার দিকেই মুখ তুলে রইলো, যেন এখনো আমি তাকে কিছু বলে চলেছি।

ভাবনা আমারও। ট্যাকসিতে যাবো বলেছি, কিন্তু বাসা পর্যন্ত যাবার সঙ্গতি আমার নেই। মনে মনে ঠিকও করে ফেলেছি- বাসায় যাবো না; এখান থেকে বেরিয়ে যাবো বুশ হাউসে। সেখানে রাতের ডিউটি যার, তাকে রাত সোয়া দু'টো পর্যন্ত থাকতে হয়, তার সঙ্গে গল্প করা যাবে; তারপর, সে চলে গেলে অফিসেই বসে থাকবো। দেশের কাগজপত্তর আছে, বই আছে, ক্যানটিন সারারাত খোলা আছে; দিব্যি সময় কেটে যাবে।

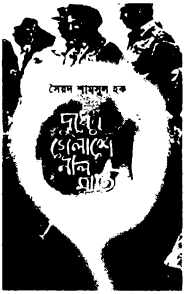

১১

আজ আমি নষ্ট করতে পারতাম মৌনাকে। সৌমেন বাড়ি ফেরেনি, সেই সুযোগটা আমি নিতে পারতাম।

কিন্তু না। বেরিয়ে পড়লাম। মৌনা আমার পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দিলো। পকেটে টাকা দেবার সময় আমাদের দেহ প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলো। চকিতে মনে পড়লো নিকির কথা। নিকি বলেছিলো, কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীকে তার দেহ দিয়ে দেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন এক ঘ্রাণ বেরোয়। সে ঘ্রাণ কেবল নারীটিই পায়।

মৌনা কি আমার দেহ থেকে সেই ঘ্রাণ পেয়েছিলো? তাই সে শেষ পর্যন্ত আমাকে ঠেলে দিলো এই কথা বলে, 'যাবেনই যদি, যান।'

শত বৎসরের নির্জনতা নিয়ে আমি হাঁটতে থাকি লণ্ডনের গভীর রাতের পথ।ভেবেছিলাম বিবিসি'র বুশ হাউসে যাবো। হলো না। পথের মোড়ে মিনি ক্যাবের দোকানে ঢুকে গাড়ি নিলাম। ভেতর থেকে নিকির মুখ, নিকির ঘ্রাণ আমাকে তাড়া দিলো অকস্মাৎ। আমি ক্যাবওয়ালাকে নিকির ঠিকানা বললাম। প্রশস্ত সড়ক সব জলে ভেজা। কোনো কোনো সড়ক জলে এখনো ডোবা। বহু বৎসর লণ্ডনে এতো বৃষ্টি হয়নি, যেমন আজ। বাংলাদেশের কান্না কি এতো জল হয়ে ঝরেছে আজ এই ছ'হাজার মাইল দূরে?'

দীর্ঘ, দীর্ঘ পথ। মৌনার বাড়ি থেকে নিকির বাড়ি অন্তত মাইল কুড়ি তো হবেই।

মিনি ক্যাব ড্রাইভার নিগ্রো। সে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'কিছু মনে করিবেন কি যদি রেডিও চালাই।'

এতোটা পথ যাবে; নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা কাটাতে তারও চাই সঙ্গী। রেডিওতে চব্বিশ ঘন্টা যে সেন্টারে বাজে শুধু পপ গান, ভেবেছিলাম সেইখানেই কাঁটা ঘোরাবে সে।

তার বদলে সে ধরলো সংবাদের চ্যানেল। দ্রুতবেগে গাড়ি চালাতে চালাতে বললো, 'এইমাত্র রাত বারোটা বাজিলো, স্যার। সংবাদ হইবে।'

সংবাদ? রেডিওতে খবর শোনবার জন্যে এতো আগ্রহ আমি আর কখনো কোন মিনিক্যাব ড্রাইভারের দেখিনি। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ এই নিগ্রোদের। সারাক্ষণ হয় তাদের দেখেছি উঁচু পর্দায় রেডিও ছেড়ে পপ গান শুনতে, নয়তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্টিল ব্যাণ্ডের ক্যাসেট বাজাতে। সংবাদ কখনোই নয়।

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের অনেকেই বেশ শিক্ষিত, অনেকেই ছাত্র হয়। আমার অনুমান হয়, আমার এই ড্রাইভার হয়তো তেমনি একজন কেউ হবে।

পিপ পিপ করে রাত বারোটা বাজার সংকেত হয় গাড়ির রেডিওতে।

বুকের ভেতরে ধ্বক করে উঠলো। হৃৎপিন্ড যেন তার একটি জীবনধ্বনি স্তব্ধতায় পার করে দিলো। আবার চলতে লাগলো- যেমন সে জন্ম থেকে, জরায়ু থেকে বেরুবোর পর থেকে, অবিরাম, একতালে, লাব-ডুব-লাব-ডুব-লাব।

সংবাদ পাঠকের কণ্ঠে প্রথমেই বাংলাদেশের সংবাদ।

'বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করা হইয়াছে। উনিশ শ' একাত্তরে বাংলাদেশের নয় কোটি মানুষ একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশটিকে স্বাধীন করিয়াছিলো। স্বাধীনতার অন্যতম মূলস্তম্ভ হিসেবে যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হইয়াছিলো, ঢাকার বর্তমান সরকারের এক ঘোষনায় আজ তা বর্জিত হইল।

চিৎকার করে উঠলাম আমি। যদিও আমি এ সংবাদ আজ সকালেই পেয়েছি, কিন্তু সে অপরের মুখে। সংবাদ পাঠকের মুখে বেতারে এখন এই সংবাদ শুনে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

বললাম, 'বন্ধ করুন, বন্ধ করুন।'

হতচকিত হয়ে নিগ্রো ড্রাইভার গাড়ির গতি অকস্মাৎ কমিয়ে দিলো। তারপর বন্ধ করে দিলো রেডিও। বললো, 'স্যার, আপনি কি অসুস্থ বোধ করিতেছেন?'

জানি না কে, আমার ভেতর থেকে কে যেন কণ্ঠ ধরে বলে উঠলো, 'নীলমাছি।'

'নীলমাছি?'

হো হো করে হেসে উঠলো ড্রাইভার।

'কোথায়?'

'গেলাশে।'

'গেলাশে?'

'দুধের গেলাশে, মিস্টার, নীলমাছি দুধের গেলাশে।'

বলেই মনে হলো, আমাকে সে বুঝি পাগল ঠাওরালো। গাড়ি সে পথের পাশে দাঁড় করালো ধীরে। বললো, 'আপনি কি বলিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কোনো হাসপাতালে কি লইয়া যাইব আপনাকে?'

'হাসপাতালে?'

লোকটি সত্যিই তবে আমাকে অসুস্থ নয়, উন্মাদ বলেই স্থির করেছে।

ভয় হলো, যদি আমাকে সে এই নির্জন পথের ওপর নামিয়ে দিয়ে যায়? যদি আমাকে অস্বীকার করে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে?

তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, 'না, আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। বড় ভালো আছি। সম্পূর্ণ ভালো আছি। আপনি গাড়ি চালান।'

নিগ্রো ড্রাইভার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

'কি হইলো?'

আমার প্রশ্নের কোনে উত্তর দিলো না সে; গাড়িও স্টার্ট দিলো না। চুপ করে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

তখন বললাম, আবার তাকে আরো আশ্বস্ত করবার জন্য, 'আমি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম খবর শুনিয়া।'

এবার সে সম্পূর্ণ মুখ ফিরে আমার দিকে তাকালো।

'খবর শুনিয়া?'

'এইমাত্র, আপনার রেডিওতে।'

'আপনি কি বাংলাদেশের হন লোক?'

'আমি বাংলাদেশের।'

নিগ্রো ড্রাইভার চাবি ঘোরালো। গর্জন করে উঠলো গাড়ির এনজিন।তাকে আবার আমি বললাম নিকির ঠিকানা।

সে বললো, 'হাঁ, হাঁ, আমার মনে আছে। সেখানেই আপনাকে লইয়া যাইতেছি।'

ক্যামডেন টাউন পেরিয়ে গেলাম আমরা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পৌঁছে যাবো নিকির দরোজায়।

মাথার ভেতরে দুধের গেলাশে নীল মাছি ভাসছে। আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে। দারুণ এই বিবমিষার ভেতরেই কবিতার লাই হু হু করে এসে যাচ্ছে দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিংহ। কিলিমানজেরোর পাহাড় চুড়ায় পড়ে আছে তারপর সেই সিংহের কংকাল। পাহাড়ের ঐ উচ্চতায় কিসের সন্ধানে গিয়েছিলো সে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেহ কি এখনো পড়ে আছে ধানমণ্ডির বাড়ির সিঁড়িতে? মানুষের দেহ কংকালে পরিণত হতে লাগে কতোদিন? একশ' বছর? কোলের ওপরে মার্কোয়েজের বইখানা তখনো আছে প্যাকেট মোড়া। শত বৎসরের নির্জনতা।

একশত বৎসর তবে এরপর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? এই ভয়াবহ নির্জনতা নিয়ে? পিতার মৃত্যুর মতো সংসারে কি এতোবড় নির্জনতা আছে?

নিকির দরোজায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে পয়সা গুণে নিয়ে নিগ্রো ড্রাইভার হঠাৎ পেছন থেকে বললো, 'স্যার।'

কলিং বেলে হাত। হাত নামিয়ে ফিরে তাকালাম।

'কি?'

আমি জিম্‌বাবওয়ের মানুষ।'

জিম্‌বাবওয়ে? একদা শ্বেতাঙ্গরা যে দেশটিকে দক্ষিণ রোডেশিয়া বলত, সেই দেশ?

নিগ্রো ড্রাইভার বললো, 'প্রার্থনা করি, সকল শুভ হউক আবার আপনার দেশে। জানি না, আমার দেশেও ভবিষ্যতে কি হইবে?'

গাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলো সে। আমি তার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাঁচ নামালো সে গাড়ির।

তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'আমিও প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের মতো দুর্ভাগ্য যেন আপনার দেশের না হয়।'

উত্তরে সে ম্লান হেসে বললো, 'প্রার্থনায় কি কিছু হয়? কেবল প্রার্থনায়? এটুকু আগে আমিও প্রার্থনার কথাই বলিয়াছিলাম। ভুল বলিয়াছিলাম। প্রার্থনায় কিছু হয় না, কিছু হয় না।'

সাঁ করে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ী পথের ঢালু বেয়ে নেমে গেল সে।

নিকির দরোজায় আমি কলিং বেলে চাপ দিলাম।

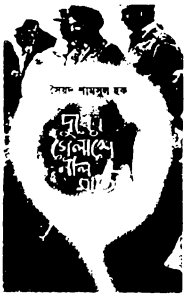

১২

রাত পোশাকে নিকি খুলে দিলো দরোজা। হঠাৎ করে হলো, ঘরে তার প্রকাশক নেই তো? নিকিরই শয্যায়?

বললাম, 'নিকি, ভেতরে আসিব?'

'এ কি! রূপকথা?'

'আসিব?'

'আশ্চর্য! এতো ইতস্তত করিতেছো কেন? কি হইয়াছে তোমার?'

'কিছু না।'

'অবশ্যই কিছু।'

বললাম, 'হ্যা কিছু। একটা কিছু। অনেক ভীষণ কিছু।'

নিকি আমার হাত ধরে বললো, 'বাহিরে শীতের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবে?'

'ভিতরে কেহ?' শংকিত কম্পিত গলায় আমি উচ্চরণ করলাম। হেসে ফেললো নিকি।

'ও, সেই প্রকাশক?' আমাকে ভেতরে নিয়ে দরোজা বন্ধ করে, নিরাপত্তা শেকল লাগিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তার ঘরের দিকে যেতে যেতে নিকি যোগ করলো, 'আমার কবিতার বই প্রকাশের জন্য লইয়াছে। আজ রাতে আসিতেও চাহিয়াছিলো আমার শয্যায়।'

অবাক হয়ে গেলাম আমার নিজের ভেতরের মানচিত্র দেখে। সমতল, সব সমতল। ঈর্ষার একটিও পাহাড় উঠলো না সেই সমতল ভেদ করে।

বললাম, 'তারপর?'

'তারপর?'

'ফিরাইলে তাহাকে?'

তিরস্কার করে নিকি বললো, 'পূর্ব দেশের তোমরা কি মনে করো, আমাদের পোশাকটা শুধু খসিয়া পড়িবার জন্যই।'

'তুমিও তো পূর্ব দেশের।'

ঘরের ভেতরে বিছানায় বসলো নিকি। সমুখে একটা গোল নরম আসনের ওপর আমি বসলাম। এই একটিই ঘর নিকির। এখানেই তার শোয়া, খাওয়া, লেখা- সবকিছু।

নিকি একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে দিয়ে বললো, 'তোমাকে যেন কেমন দেখাইতেছে, মাহতাব।'

সিগারেট ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি খাও, আমি আরেকটা ধরাইয়া লইতেছি।'

'না, রাতে আমি সিগারেট খাই না।' তারপর যোগ করলো, 'হাঁ, পূর্ব দেশের আমিও বটে। আমার পিতামহ আসিয়াছিলেন ইণ্ডিয়ার বিহার হইতে মরিশাসে। আখের ক্ষেতে কুলির কাজ করিতে। মরিশাস হয় এক অদ্ভূত দেশ। সমুদ্রের ভিতরে কাছিমের খোলের প্রায় ভাসিয়া থাকা আমার দেশ। মৃত সে কাছিম। সেই কাছিমের পিঠে কতো দেশের মানুষ আসিয়া একদণ্ড দাঁড়ইয়াছে। কেউ কেউ রহিয়াও গিয়াছে। সেই যে রূপকথায় আছে না? মস্ত এক কাছিম। তার পিঠ মনে হইয়াছিলো যেন একখন্ড দ্বীপ। সেই পিঠের উপর জ্বালিয়াছিলো রান্নার আগুন। আগুনের উত্তাপে নড়িয়া উঠিয়াছিলো কাছিম। আর তাহারা পলাইয়া গিয়াছিলো ভয়ে। কেউ কেউ জলে ঝাঁপ দিয়াছিলো। এ আমি কি বলিতেছি? এ আমি কি বলিতেছি? মা- আজ বড্ড বেশি মদ গিলিয়াছি। সেই প্রকাশক আমাকে আজ সারা দুপুর মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিতে চাহিয়াছিলো। মাতাল করিয়া আমাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ছলে থাকিতে চাহিয়াছিলো সারারাত। একটা কবিতার বই প্রকাশের মূল্য হিসাবে সে চাহিয়াছিল আমার এই মাংস।' বলতে বলতে নিকি তার রাতের পোশাকের ফিতে খুলে প্রকাশিত করে দেখালো দেহ। ট্রয়ের যুদ্ধের শেষে ইথাকার দিকে ঘরে ফেরা ইউলিসিস দেখেছিলো যে মায়াবিনী সার্সিকে- যেন আমার সমুখে সার্সি এখন নিকি।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি।

নিকি আর আমার ভেতরে দুধ -সেই দুধে নীল মাছি –এই তো আজ না গতকাল? গতকাল না গত বৎসর? শত বৎসর আগে বুঝি? কিন্তু এ দুধ, অকস্মাৎ আমি আবিষ্কার করি, নিকি আর আমার মধ্যে নয়। অন্যখানে। অন্য কোথাও।

নিকি হঠাৎ আমার কোলের ওপর বসে পড়লো। ছড়িয়ে ধরলো গলা। কানের লতিতে নরম দাঁতে লালচিহ্ন এঁকে দিলো।

বললে, 'অপরাহ্নে তোমার আসিবার কথা। প্রকাশককে কতো কষ্টে ছাড়াইয়া আমি তোমার জন্য বসিয়া আছি, মাহতাব। তোমার জন্য তৈরি হইয়া আছি, মাহতাব।'

আমার মাথার ভেতরে দুধের গেলাশ। সেই দুধে নীলমাছি। বকুল নয়, মৌণা নয়, নিকিও নয়।

আমার চোখ ভিজে এলো।

'তুমি কাঁদিতেছো?'

আমি চুপ করে রই।

আমার জামার বোতাম খুলে ঘ্রাণ নিলো নিকি। অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে উঠলো, 'কই, কবি, কই? তোমার দেহে সেই ঘ্রাণ কই, কবি?'

ধীরে তাকে দু'হাতে কোল থেকে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিলাম।

দীর্ঘ একটি নিশ্বাসের শব্দ হলো নিকির বুক থেকে।

'নিকি?'

সে নীরব।

'নিকি?'

তবু সে নীরব।

নিকির পাশে বসলাম আমি। তার হাতখানি তুলে নিলাম হাতে। সে হাত রাখলাম আমার বুকে।

বললাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, নিকি।'

চঞ্চল হয়ে উঠলো নিকির চোখ এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর মুখ ফিরে নিলো সে।

চুম্বনের প্রত্যাশা বুঝি ছিলো তার।

বললাম, 'সেই যে বলিয়াছিলাম, নিকি, কবিতার একটি লাইন ঘুরিতেছে আমার করোটিতে। কবিতাটা এই মুহূর্তে আমার করোটির ভিতরে তৈরি হইতেছে -হইয়া গিয়াছে -এই সেই কবিতা -শুনিবে?'

বাংলা জানে না নিকি। অতীতে কতোবার কতো রাত কতো দিন কতো সন্ধ্যে আমার কবিতা তাকে ধীরে ধীরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছি।

একটি মুহূর্তের জন্যেও এখন আমার মনে পড়লো না যে, নিকি বাংলা জানে না। নিকির হাত আমি আমার বুকের ওপর চেপে ধরে আবৃত্তি করে উঠলাম ঃ

ভীষণ তৃষ্ণার্ত আমি, এই তৃষ্ণা কিন্তু
আজ জলের কারণে নয়, এ তো নয়
সাহারা যে এখানে কোথাও এক বিন্দু
নেই জল। এযে সেই জন্মভূমি, বয়
এখানে তেরোশ' নদী, ব্রহ্মপুত্র জল

এখানে যমুনা আর মেঘনার সাথে
মিলে মিশে বারো মাস করে খলখল
গ্রাম গঞ্জ জনপদ ভাসে বৃষ্টিপাতে।
এখানেই তৃষ্ণা তবে পেলো অকস্মাৎ
জল নয়? তবে কিসে মিটবে পিপাসা?
পিপাসায় ব্যগ্র আমি বাড়িয়েছি হাত।
হঠাৎ সবুজ মাঠ ছিঁড়ে উঠে আসা
দুধ-মাতৃদুধ-দেখি বুকের গেলাশে
কিন্তু নীল মাছি আর কি ভীষণ তৃষা!
শতাব্দীর নির্জনতা ক্রমে ঘিরে আসে-
তবু এই দুগ্ধপান- হোক বিবমিষা!
বমন করছি আমি দূর পরবাসে।

বললাম, 'কবিতাটা যেমন আসিয়াছিলো, তেমনি বলিলাম। একটু কাগজ দাও। লিখিয়া রাখি। পরে কিছু সংশোধন করিতে হইবে।'

নিকি কবি। নিকি জানে কবিতা অধরা, কিন্তু যখন সে ধরা দেয় তখনই তাকে অক্ষরপাতে বন্ধী না করলে উড়ে যায়।

দ্রুত সে জ্বেলে দিলো লেখার টেবিলে বাতি। বললো, 'সারারাতও যদি লাগে, আমি অপেক্ষা করিবো। তুমি লেখো। সংশোধন করো। নিটোল করিয়া তোলো তোমার কবিতা।'

দ্রুত হাতেই লাইনগুলো লিখে ফেলে নিকির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শয্যায় শুয়ে আমারই অপেক্ষা করছে সে।

উজ্জ্বল চোখ করে নিকি বললো, 'শেষ? সংশোধন করিলে না?'

'এখানে নহে। এখন নহে।'

'না।'

এখন নয়

'তবে কখন? তবে কোথায়?'

'বাংলাদেশে। আমি কালই বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইবো, নিকি। বঙ্গবন্ধুর রক্তে আমার লেখার কলম এই কবিতা লইয়া কাজ করিব। নিকি, তুমি জানো নিকি, বড় দীর্ঘ-দীর্ঘদিন আমি সব ভুলিয়াছিলাম। আবার সব ফিরিয়া পাইতে চাই। মনে করিতে চাই! বুকের ভিতরে চাই। রক্তের ভিতরে চাই। বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে বাংলাদেশ, আমি সেই বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইব, ফিরিয়া যাইতে চাই। বমন যদি করিতেই হয়, তবে বমন করিবো আমার অক্ষর, আমার

শব্দ, আমার ক্রোধ, আমার আগুন। নিকি, আমাকে বাড়ি ফিরিবার গাড়ি ডাকিয়া দাও।' আমার কান্না কম্পিত হৃদয়ের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসবার কালে দিল্লীতে দেয়া তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দীদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল; আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে।

❑